অনীক

এপ্রিল ২০১৫
বর্ষ ৫১ □ সংখ্যা ১০
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী

সম্পাদকীয় □ ১

ঘটনাপ্রবাহ

গণ-আন্দোলন ও *আপ* সরকার? ❑ প্রণব দে ❑ ২
কৃষক আত্মহত্যা... ❑ গৌতম সেনগুপ্ত ❑ ৩
হ্যাঁ, হত্যা হয়েছিল, কিন্তু... ❑ তড়িৎ চৌধুরী ❑ ৫
'কর্পোরেট কর্জা মাফি'... ❑ শ্যামল দাস ❑ ৬

প্রবন্ধ

ওবামার সফর ও নিউক্লিয়ার চুক্তি ❑ সমরেশ মিত্র ❑ ৯
ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সত্তর বছর ঃ ফিরে দেখা ❑ অশোক চট্টোপাধ্যায় ❑ ১৩
বাংলাদেশে মুক্তচিন্তার সংকট ও সেখানকার সিভিল সোসাইটি ❑ অংশুমান ভৌমিক ❑ ২৩

ধারাবাহিক রচনা

...মুর্শিদাবাদের শ্রমিক-কর্মচারি আন্দোলন ❑ অরূপ চন্দ্র ❑ ২৬

স্মরণ

বাবুর আত্মদহন : ওয়াশিকুর রহমান বাবু ❑ কিশলয় ব্যানার্জী ❑ ৩৭
তাহিরা মাজহার আলী খান ❑ ওমর তারেক আলি ❑ ৩৯

লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা :
প্রযত্নে : পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
দূরভাষ : ৯৪৩৩৭২৪৪৬২/৮৯০২১০৪৯৮৭
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : ১৫০ টাকা
ই-মেল : aneek.bm@gmail.com
ব্লগ : aneekpotrika.wordpress.com

কার্যালয় :
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯
(মঙ্গল ও শুক্র : সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৮টা)
সম্পাদকমণ্ডলী : **রতন খাসনবিশ**
সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব

সম্পাদকীয়

কেউ খুন হয়না রাষ্ট্রিয় বুলেটে

ভারত দেশটাকে কীভাবে বর্ণনা করা যায়? সংবিধান সম্মত "সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক" রাষ্ট্র? না বাস্তব সম্মত 'গরিব দলনকারী, গণহন্তারক, গুণ্ডাশাহী' রাষ্ট্র? শুধু গণহত্যাই যে রাষ্ট্রের ধর্ম হয়ে উঠেছে তাই নয়, এ দেশে হত্যাকারীদের শাস্তিবিধানও হয়না। গত ৭ এপ্রিল, অন্ধ্রে সেশাচালাম রক্তচন্দন বনে ২০ জন নিরস্ত্র, হতদরিদ্র দিনমজুরকে গুলি করে হত্যা করে রাজ্য টাস্ক ফোর্সের পুলিশ রক্তবন্যা বইয়ে দিয়েছে। এরা নাকি কাঠ পাচার করছিল। তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যই নাকি পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছে। এরা এমনই আক্রমণকারী, যাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিলনা। তারা নাকি পুলিশকে তাক করে পাথর ছুঁড়েছিল। আহারে, হেলমেটধারী বীরপুঙ্গবরা পাথরের ঘায়ে মূর্ছা যায়, যদিও কোনো পুলিশকেই ঘায়েল হতে দেখা যায়নি। এমনই কর্তব্যপরায়ন পুলিশ, যারা অকুস্থল থেকে কাউকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করতে পারেনি। আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য হচ্ছে, এদের মধ্যে সাতজনকে নাকি পুলিশ অন্ধ্রগামী বাস থেকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে যায় এবং সাজানো সংঘর্ষে সবাইকে হত্যা করে।

পুলিশ খুব ভালো করেই জানে, সেশাচালাম অরণ্যে যাদেরকে তারা হত্যা করেছে, তারা কেউই পাচারকারী নয়। অতিরিক্ত মজুরির লোভ দেখিয়ে তাদের ভাড়া করা হয়েছে মাত্র। এইসব দরিদ্র পাহাড়িয়া অধিবাসীদের পক্ষে অতিরিক্ত মজুরির আকর্ষণ উপেক্ষা করা দুষ্কর। দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধে একটু স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ পেতে এরা আড়কাঠির কবলে পড়ে। চেন্নাই, বাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদের প্রাসাদবাসী যারা আদত চোরাচালান ব্যবসায়ী, তারা পুলিশ-প্রশাসনের অচেনা নয়, কিন্তু অর্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবের রক্ষাকবচে তারা আইনের বৃত্তে অধরা। দৈবাৎ ধরা পড়লেও পুলিশ-প্রশাসন-আদালতের অনুগ্রহে জামিন পেতে দেরি হয়না। বিচারও হয়না। বেআইনি রক্তচন্দন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অন্ধ্রের ক্ষমতাসীন ও বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সম্পর্ক এতটাই গভীর যে, জঙ্গল দখলের প্রতিযোগিতায় বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার জন্য প্রশাসনকে ব্যবহার করতে এরা পিছপা হয়না। টাস্ক ফোর্সও তাদের কর্মতৎপরতা দেখাতে মাঝেমধ্যেই 'সংঘর্ষের' অবতারণা করে এবং অপরাধী ধরতে আশপাশের গ্রামগুলিতে অভিযান চালায়। এইসব অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তথাকথিত প্রশাসনিক কর্মতৎপরতার বলি হয় গরিব এবং নিম্ন-সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীরা। ২০১১ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত 'সংঘর্ষের' বলি ১১ জনের প্রায় সকলেই এবং কাডাপা ও নেলোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক চন্দন-বন্দীদের ৯৫ শতাংশ তপশিল ভুক্ত ও তপশিল বিযুক্ত (denotified) উপজাতি।

তেলেঙ্গানা পুলিশ ঐ ৭ এপ্রিল, ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঁচ বিচারাধীন বন্দী যুবককে নির্জন রাজপথে গুলি করে খুন করেছে। বন্দীদের সবায়ের হাতে হাতকড়া লাগানো ছিল এবং একজন বাদে বন্দীদের সবাই ছিল গাড়ির মধ্যে। সুতরাং এক্ষেত্রে 'সংঘর্ষ' তত্ত্ব ঠিক খাটে না। কেন খুন হলো এই পাঁচ যুবক? প্রতিশোধ স্পৃহায় না সাম্প্রদায়িক জিঘাংসায়? যাই হোক না কেন, এটা যে পূর্ব-পরিকল্পিত এক হত্যাকাণ্ড, তা অনস্বীকার্য।

কোনো ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সরকারের হেলদোল নেই। যেন এ সবই প্রাত্যহিক ঘটনা। দলিত, সংখ্যালঘু আর আদিবাসীদের জীবনের দাম কী? উত্তরপ্রদেশে হাসিমপুরায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ৪২ জনকে পিএসি জওয়ানরা খুন করলেও আদালত খুনিকে খুঁজে পেল না। লক্ষ্মণপুর বাথে, বাথানিটোলা—কোথাও খুনি খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্ধ্র, তেলেঙ্গানায় কি কেউ খুন হয়েছে? কেউ খুন হয়নি! রাষ্ট্র কাউকে খুন করেনা! "আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই জানেনা বুলেটেরা"।

ঘটনাপ্রবাহ

গণ-আন্দোলন বিরোধিতার চিরাচরিত পথেই কি আপ সরকার?

প্রণব দে

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৫— অরভিন্দ কেজরিওয়াল দ্বিতীয়বার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন। চমকপ্রদ প্রত্যাবর্তন, সম্ভবত ২০১৫ সালের সেরা রাজনৈতিক চমক। গদিতে বসেই 'বিজ্‌লি হাফ, পানি মাফ'-এর আদেশ জারি করে কেজরিওয়াল সমালোচকদের মুখে একেবারে চাবি লাগিয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, সমাজকর্মীদের একাংশ আপ-এর এহেন উত্থান ও ভূমিকায় উদ্বেলিত এবং এলিটিস্টদের কেউ কেউ *আপ*-এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে বিপন্ন গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। কিন্তু দিল্লির মজদুররা যখন 'ওয়াদা' পূরণের দাবি নিয়ে হাজির হয়, তখন চিরাচরিত প্রথায় *আপ* সরকার তাদের মোকাবিলা করে পুলিশের লাঠির মাধ্যমে।

ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লিতে শুরু হয়েছে 'ওয়াদা না তোড়ো অভিযান'। বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন, নারী সংগঠন, ছাত্র সংগঠন এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আন্দোলনের দাবি ছিল— স্থায়ী কর্মক্ষেত্রে কনট্রাক্ট প্রথা বাতিল, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, দিল্লি সরকারে ৫৫ হাজার শূন্যপদ পূরণ, ১৭ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও কনট্রাক্ট শিক্ষকদের স্থায়ীকরণ, সমস্ত সাফাই কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ ইত্যাদি। ৬ ফেব্রুয়ারি দিল্লি মজদুর ইউনিয়নের প্রায় দু'হাজার শ্রমিক কনট্রাক্ট প্রথা বাতিলের দাবিতে দিল্লি সচিবালয়ের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাঁরা শ্রমমন্ত্রী গিরিশ শোনি-কে একটি স্মারকলিপিও পেশ করেন। ১৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সহ অন্যান্য বেশ কিছু ছাত্র সংগঠন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পেশ করে। ৩ মার্চ দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের কনট্রাক্ট কর্মীরা কেজরিওয়াল সরকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ করতে গিয়ে প্রথম লাঠিচার্জের সম্মুখীন হন। ২৫ মার্চ প্রায় ৩৫০০ শ্রমিক সচিবালয়ের অদূরে কিষান ঘাট অঞ্চলে জমায়েত হন। ৭০০ জনের মতো কনট্রাক্ট-শিক্ষকও সচিবালয়ের আর এক প্রান্তে বিক্ষোভ জমায়েতে সামিল হয়েছিলেন। সকাল থেকেই র‍্যাফ এবং সিআরপিএফ বিক্ষোভ-স্থলটিকে ঘিরে রেখেছিল। ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে শ্রমিকরা মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশের উদ্দেশ্যে মিছিল করে রওনা হন। প্রথম ব্যারিকেডেই পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে এবং তাদের ফিরে যেতে বলে। বিক্ষোভকারীরা সরকারের কোনো প্রতিনিধির উপস্থিতি এবং স্মারকলিপি গ্রহণের দাবি করলেও পুলিশ কর্ণপাত করেনা। এরপর মিছিল সচিবালয়ের দিকে অগ্রসর হওয়া মাত্র সরকারের রক্ষীবাহিনী কোনোপ্রকার সতর্কীকরণ ছাড়াই বেদম লাঠিচালনা শুরু করে এবং বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া করে। বেশ কয়েকজন মহিলা বিক্ষোভকারী পুলিশের লাঠিতে সাঙঘাতিক আহত হন।

পুলিশ ও রক্ষীবাহিনীর লাঠি চালনা সত্ত্বেও, আন্দাজ ১৩০০ বিক্ষোভকারী ব্যারিকেডের ভিতর তখনও অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বারংবার আবেদন করা সত্ত্বেও পুলিশ আন্দোলনকারীদের স্মারকলিপি প্রদানের জন্য সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। বিপরীতে, অবস্থানকারীদের হটাবার জন্য তারা আবার লাঠিচার্জ শুরু করে। দ্বিতীয় দফার লাঠি চালনায় পুলিশ ছিল আরও নির্মম, আরও ভয়ঙ্কর। পুরুষ পুলিশরা মহিলাদের রেয়াত করেনি। অনেকেই আহত হয়েছেন, অনেকে জ্ঞান না হারানো পর্যন্ত পুলিশের প্রহার সহ্য করেছেন। তবুও বিক্ষোভকারীরা মাটিতে শুয়ে পড়ে সত্যাগ্রহ চালিয়ে গেছেন। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে সত্যাগ্রহীদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে তাঁরা রাজঘাটে আশ্রয় নেন। পুলিশ ও র‍্যাফ সেখানেও তাঁদের তাড়া করে। ১৮ জন বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশ্য আদালতে পেশ করার পর সকলেই জামিন পেতে সমর্থ হন।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, একটা সরকার সদ্য ক্ষমতায় এসেছে, তাকে সুস্থির হওয়ার সুযোগ না দিয়ে আন্দোলন করে ব্যতিব্যস্ত করা হচ্ছে কেন? শ্রমজীবী মানুষের অযুত সমস্যা। রাতারাতি সমস্ত সমস্যার সমাধান যে সম্ভব নয়, এটা সকলেই বোঝে। কিন্তু কর্পোরেট সেক্টরের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের দ্বৈরথ চলছে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক হচ্ছে বৃহৎ পুঁজি। রাষ্ট্রীয় কানুন, রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা কর্পোরেট পুঁজির দস্তুর মেনে চলে। ভারতের সংবিধান পুঁজি আর শ্রমের সমানাধিকার স্বীকার করেনা। পুঁজি যদি রাষ্ট্র বা সরকারের মাধ্যমে শ্রমের অধিকার সঙ্কোচন করার প্রয়াস নেয়, শ্রমও তার নিজ অধিকার বজায় রাখার জন্য পাল্টা জোরের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কাজেই আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমজীবী মানুষের দাবি সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত রাখা সচেতন শ্রমিকশ্রেণীর অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। এটা না করলে শ্রমজীবী মানুষ তার নিজের পরিসরটুকু হারাবে।

'ওয়াদা না তোড়ো অভিযান' আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, আপ সরকারকে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো সম্বন্ধে সচেতন করা। একটা সরকার যদি স্বচ্ছতা ও সত্যনিষ্ঠার দাবি করে, তাহলে শ্রমিকদের স্মারকলিপি গ্রহণে তাদের তো আপত্তি থাকার কথা নয়। সরকার সংগঠনগুলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তখনই গররাজি হয়, যখন তার দাবি পূরণের ক্ষমতা বা ইচ্ছা

কোনোটাই থাকে না। পুঁজির চাপ বৃদ্ধি পেলে শ্রমের প্রতি সরকারের দায়বোধ কমে। শ্রমজীবী মানুষের মুখোমুখি হতে সরকারের অনাগ্রহ বৃদ্ধি পায়। *আপ* সরকারের শ্রমমন্ত্রী, দিল্লি মজদুর ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সুস্পষ্ট বলেছিলেন, 'কনট্রাক্ট প্রথা বাতিল করার জন্য আইন প্রণয়নের কথা তিনি ভাবছেন না, কারণ যে সব কোম্পানি বা ম্যানেজমেন্ট কনট্রাক্ট শ্রমিক ভাড়া করে, তাদের কথাও ভাবতে হবে।' এটাই হচ্ছে আসল কথা। এটাই হওয়ার কথাও। ক্ষমতায় থাকতে হলে পুঁজিকেই, বিশেষত কর্পোরেট পুঁজিকে, মান্যতা দিতে হবে। পুঁজির এই সার্বভৌম কর্তৃত্বের কাছে নতি স্বীকার করতে বামফ্রন্ট সরকারও শ্রমিক আন্দোলনের রাশ টেনে ধরেছিল। মমতা থেকে মোদী সরকার, প্রত্যেকেই জনতার মুখ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। স্বচ্ছতার দাবিদার *আপ* সরকার ইতিহাসের নিয়মে সেই একই পথে কি হাঁটতে শুরু করেছে?

কৃষক আত্মহত্যার রাষ্ট্রীয় কর্মসূচির নেপথ্যে

গৌতম সেনগুপ্ত

আমাদের রাজ্যে আলুচাষিদের আত্মহত্যা সংবাদপত্রের পাতায় ধর্ষণের মতই একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রীকুল নেত্রীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আত্মহত্যাকারী আলু চাষিদের চারিত্রিক দোষ, পারিবারিক কলহ ইত্যাদি কারণের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। যেমন সরকারে আসার অব্যবহিত পরেই পার্ক স্ট্রিটের সদ্যপ্রয়াতা ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে তীর্যক মন্তব্য করেছিলেন বর্তমান নেতৃত্ব। আলুচাষিরা (সরকার কর্তৃক) চরিত্র হননের ঝুঁকি মাথায় নিয়েই আত্মহত্যা করে চলেছেন। যদিও মন্ত্রীকুল এখনও এ প্রশ্ন তোলেননি, চাষিরা আলু চাষ না করে আপেল চাষ করেন নি কেন? অদূর ভবিষ্যতে এরকম সরকারি ঘোষণা শুনলেও অবাক হবার কিছু নেই। 'মা-মাটি-মানুষের' সরকার বলে কথা!

এবার আলুর ফলন গত বছরের তুলনায় ১৫ শতাংশ বেশি হয়েছে। এ বছর আলুর মোট উৎপাদন আনুমানিক ১১০ লক্ষ টন। আলু ওঠার পরপরই (অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত) চাষিরা আলু বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছেন ১৪০ টাকা বস্তা দরে। এক বস্তায় আলু থাকে ৫০ কিলো (অর্থাৎ চাষিরা আলু বিক্রি করেছেন ২.৮০ টাকা কেজি দরে)। গত বছর চাষিরা আলু বেচেছিলেন ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা বস্তা দরে। এবছরে তাঁরা দাম পেয়েছেন গত বছরের অর্ধেকেরও কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাশের রাজ্যগুলিতে যেমন উড়িষ্যা, বিহার ও ঝাড়খণ্ডেও এবার আলুর ফলন ভালো হয়েছে। গত বছরের পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাশের এই রাজ্যগুলিতে আলু পাঠানো নিয়ে সমস্যার কারণে ওই রাজ্যগুলিতে আলু চাষের এলাকা বেড়েছে, ফলনও ভালো হয়েছে। ফলে রাজ্যের উৎপাদনের যে ৪০ শতাংশ আলু পাশের রাজ্যগুলিতে যেত, তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জনৈক বৃহৎ আলু-ব্যবসায়ীর (আলু-ব্যারন বলাই ভালো) মতে, ১৫ মে থেকে ১৫ ডিসেম্বর আমাদের রাজ্যে আলু লাগে ৪২ লক্ষ টন। আরও ৫-৬ লক্ষ টন ব্যবহৃত হয় বীজের জন্য। মোটামুটি ৬৩ লক্ষ টন আলু রাজ্যের হিমঘরগুলিতে রাখা যায়। যদি অন্য রাজ্য থেকে চাহিদা বেশি থাকে তবে আমাদের কোন সমস্যা নেই। তাঁর মতে, সরকার যেন চেষ্টা করে যাতে ব্যবসায়ীরা তাদের উৎপাদন দক্ষিণ ভারতের বাজারে বিক্রি করতে পারে ("...The government should try to help traders sell their produce in south Indian markets")। [*Economic Times*, 20.3.15]

ধার-কর্জ করে আলু উৎপাদন করল চাষিরা। দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে চাষিরা। জনৈক আলু-ব্যারন পতিত পাবন দে, যিনি আবার পশ্চিমবঙ্গ হিমঘর সমিতির সদস্য অর্থাৎ হিমঘর মালিক, তিনি নিজের ও অন্য আলু-ব্যারনদের পক্ষ থেকে দাবি পেশ করেছেন সরকারের কাছে। অন্যদিকে আলু-চাষিরা, আরো স্পষ্ট করে বললে প্রান্তিক আলু-চাষিরা, কোন সংগঠিত আন্দোলন দূরের কথা, ব্লক স্তরে বা পঞ্চায়ত স্তরেও কোন বড়সড় বিক্ষোভও করতে পারলেন না। অনতি-অতীতে যারা ছিলেন সরকার পক্ষ ও বর্তমানে বিরোধীপক্ষ, তারা নিয়মমাফিক কিছু বিক্ষোভ দেখিয়েছেন এটাও সত্য। যদিও একথা বলা যেতেই পারে, তাঁদের জমানাতে আলুচাষি অনেক সময়েই ফসলের ন্যায্য দাম পাননি। মাঠের ফসল মাঠেই পচেছে এবং আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে।

আলুচাষের এহেন সংকট চক্র-বৃত্তের মত চার-পাঁচ বছর অন্তর ঘুরে ঘুরে আসে। চাষির জানা নেই, কোন্ বছর এ ধরনের সংকট আসবে। কৃষিপণ্যের ব্যবসার জটিল হিসেব-নিকেশ, কৃষিকে ঘুরিয়ে চুক্তি-চাষের খপ্পরে ফেলার ষড়যন্ত্রীদের নীল নকশার জাল ছিঁড়ে ফেলার মতো রাজনৈতিক বুদ্ধি বা তাগদ অর্জন করতে না পারলে তার নিস্তার নেই। তার আছে এক খণ্ড জমি। কোথাও সে মালিক বা ভাগচাষি, কিংবা লিজে নিয়ে আলু চাষ করেছে। শিয়াখালা বা চাঁপাডাঙ্গা বাজারে রোডের ওপর আছে বীজ-সার-কীটনাশকের দোকান। গেল বছর আলু চাষে ভালো লাভ পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং অর্ধেক টাকা দিয়ে বা ধার করে পুরো টাকা দিয়ে বীজ-সার-কীটনাশক কেনা হলো। বীজ-সার-কীটনাশকের দেশজ বা বহুজাতিক কোম্পানি ও স্থানীয় ব্যবসায়ী তাদের লাভের টাকা ঘরে তুলল। ওদিকে হিমঘরে জায়গা নেই। এর মধ্যে আলু ভাজা-চিপ্‌সের কোম্পানি

বিভিন্ন হিমঘরে কম দামের সুযোগে অনেক আলু কিনে মজুত করেছে। শাসক দল বা হিমঘরের লোকেদের সঙ্গে মাখামাখি-ওঠাবসা না থাকলে চাষির জন্য হিমঘরেও জায়গা নেই। আর এত কিছুর পর হিমঘরে জায়গা পাওয়া গেলেও মে-জুন মাসে দাম উঠবেই এমন ভরসা কোথায়? এছাড়া আলুর বন্ড নিয়ে কালোবাজারী আছেই। যা অতীতেও ছিল। কৃষক সমিতি এতদিন জমি দখল/বর্গার দাবিতে আন্দোলন করতে শিখিয়েছিল। কিছু ক্ষেত্রে জমি দখল বা বর্গা হয়েছেও। জমি পাওয়া গিয়েছিল সেই গত শতাব্দীতে। তারপর আরও টুকরো হয়েছে জমি। কিন্তু চাষ তো করতেই হয় চাষিকে। বীজ-সার-কীটনাশক-হিমঘর-পেপসি-লেস্-চিপ্স-আলুডাস্ট কোম্পানীর এই শতমুখী আক্রমণ কীভাবে ঠেকাবে চাষি। কৃষক সমিতি বা অন্য ধারার কৃষক আন্দোলনের কথা যারা বলতেন তাঁরাও যেন এই শতমুখী আক্রমণের সামনে থমকে দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং দিশাহীন কৃষকের সামনে তখন একমাত্র রাস্তা আত্মহত্যার। আর সম্ভবত ঘটছেও তাই।

এই সুযোগে বাঙালির স্বঘোষিত অভিভাবক আনন্দবাজার পত্রিকা ৩১ মার্চ ২০১৫ পত্রিকায় চুক্তি-চাষের পক্ষে ওকালতি করেছেন। বাংলার কৃষকের এই দুর্দশার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তাদের উপদেশ দিচ্ছে, তোমরা 'নীলচাষী' ব'নে যাও, চুক্তি চাষ করো। ধান, সব্জি বা অন্য চাষ তোমার করার দরকার নেই। তুমি যার সাথে চুক্তিবদ্ধ, সে যে রকম চাষ করতে বলবে তুমি তাই করবে। 'নীলকর সাহেব'দের নির্দেশ মানাই তোমার কাজ— কারণ তুমি তার সাথেই চুক্তিবদ্ধ। বিদর্ভ বা তেলেঙ্গানার তুলো চাষিরা বা মধ্যপ্রদেশের সয়াবিন চাষিরা কেন দলে দলে আত্মহত্যা করল তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। আড়কাঠিরা বা যদুরামের দলেরা বা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কর্নওয়ালিসের উমেদাররা এরকমটাই করে থাকে তা আবার প্রমাণ হল। জনৈক ম্যানেজমেন্ট পাশ আলুচাষি চুক্তিচাষ করে কী রকম সাফল্য পেয়েছেন তার বর্ণনা দেওয়া আছে ঐ দিনের আনন্দবাজার পত্রিকায়। তর্কের খাতিরে যদি উপরোক্ত আলুচাষির চুক্তিচাষের সাফল্যের কথা সত্যি বলে ধরে নেওয়া হয়— তাহলে অন্য আলু চাষিদের উচিত তার পদাঙ্ক অনুসরণ করা। এখন হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া বা হাওড়ায় আলুচাষিরা সবাই যদি চিপস্ বা ডাস্টের জন্য আলু চাষ করতে শুরু করেন তাহলে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেয়ে যাবে না তো! আমরা জানি চিপ্স বা আলু-ডাস্টের আলুর জাত আলাদা। রোজকার খাবারের পাতে তা সব্জি হিসেবে খাওয়া চলে না। এই আলু চাষ শুরু হলে গ্রাম শহরের গরিব-গুর্বো মানুষের পুষ্টির অন্যতম জোগান আসবে কোথা থেকে? আলু চাষে যদি পুরো মাত্রায় যান্ত্রিকীকরণ ঘটে (ওই ম্যানেজমেন্ট পাশ আলু চাষির মতো) তা হলে হাজার হাজার গ্রামীণ খেতমজুরেরা যাবে কোথায়! উত্তরটা আমাদের জানা আছে। তারা শহরমুখী অসংগঠিত শ্রমিকের মিছিলে যোগ দিয়ে বাইপাসে 'ধারাবি' জাগাবে। দিল্লি, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, সুরাট, ভাবনগরের জন্য হাওড়া থেকে ট্রেন ধরবে।

নীলচাষের বিরুদ্ধে নীল বিদ্রোহ ঘটেছিল। তেভাগা-আধিয়া-নকশালবাড়ি-৬০ দশকের কৃষক আন্দোলন/বিদ্রোহের ঘটনা আজ ইতিহাস বা গবেষণার বিষয়। একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি অবস্থান করছি আমরা। বিদর্ভের কৃষক-আত্মহত্যা এখন মারাঠাওয়াড়াতেও বিস্তৃত। ২০১৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত ২৬৪ জন চাষি আত্মহত্যা করেছেন সেখানে (এনডিটিভি, ১০/৪/১৫) । এরা সবাই অর্থকরী ফসল (মুসাম্বি লেবু, তুলো, বেদানা, আঙুর, জোয়ার) চাষ করতেন। পশ্চিমবঙ্গের আলু চাষিদের মতো এঁরাও বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার রাস্তা। বিদ্রোহের পথে পা বাড়াননি। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়িত ভারতে এই আত্মহননের মিছিলকে আটকানোর জন্য প্রয়োজন সময়োপযোগী একটি কৃষি কর্মসূচির। যা প্রণয়ন করতে পারেন একমাত্র বিপ্লবী বামপন্থীরা, যাঁরা কেবলমাত্র লোকসভা-বিধানসবার মধ্যেই আবদ্ধ নন। কারণ এটা মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটি কৃষক-আত্মহত্যাই আসলে তাঁদের হতাশা বা ক্ষোভের বিয়োগান্তক পরিণতি।

মা-মাটি-মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী, এই প্রান্তিক চাষিদের বড় অংশই আপনাকে বা আপনার দলকে ভোট দিয়েছিলেন। আর ক্ষমতায় এসেই আপনি সরকারি টাকা বিলোতে শুরু করলেন এই রাজ্যের মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় সংগঠনগুলিকে। গ্রাম-শহরের ক্লাবগুলিতে দেদার সরকারি টাকা বিলোলেন, গ্রাম-শহরের বেকার যুবকদের মুখিয়া অংশকে সরকারি দলের-দলতন্ত্রের তাঁবেদার করে তুলতে। জেলায় জেলায় শুরু করলেন মাটি উৎসব, জঙ্গলমহল উৎসব, উত্তরবঙ্গ উৎসব। সব মিলিয়ে এবাবদ খরচা করলেন ৫০০ কোটি টাকা বা তারও বেশি। শুধু ক্লাবগুলিকেই বিলিয়েছেন ১০০ কোটি টাকার বেশি। ছোট-প্রান্তিক-ঋণগ্রস্ত আলুচাষিদের সমস্ত আলু কিনতে আপনার কত টাকা খরচা হত? সেই আলু কিনে খাদ্য দফতরের মাধ্যমে আপনি রেশন মারফত বিক্রি করতে পারতেন মে থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। খাওয়াতে পারতেন মিড ডে মিল-এর অঙ্গনওয়াড়ির বাচ্চাদের। তারা একটু সবল হত। চাল-ডালের সাথে আলুর তরকারি পেত। আলু-ব্যারন আর হিমঘর মালিকদের কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। এসব আপনার অজানা নয়। কিন্তু করেননি। আলু-ব্যারন-হিমঘর মালিক বা কোনও আম্বানি-আদানিদের সাথে কৃষি ব্যবসার বিস্তারের জন্য গোপন বোঝাপড়ার কারণে নয় তো? পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ২০০৪-০৫-এর রেশন বিদ্রোহ সংঘটিত করেছিল এই প্রান্তিক ছোট চাষি আর নিম্নবর্গের খেত মজুররা। সিপিএম পরিচালিত দলতন্ত্রকে প্রথম ধাক্কা দিয়েছিল এরাই। প্রান্তিক মানুষ ইতিহাস বোঝে জীবন দিয়ে। বই পড়ে বা গবেষণাপত্র পড়ে নয়। কে বলতে পারে কখন কোন্ দিক থেকে ধাক্কা আসবে। আমরা সেই ধাক্কার অপেক্ষায় থাকব।

হ্যাঁ, হত্যা হয়েছিল, কিন্তু...

তড়িৎ চৌধুরী

হ্যাঁ, ২২ মে ১৯৮৭ মীরাট জেলায় হাসিমপুরা মহল্লা থেকে প্রভিন্সিয়াল আর্মড কনস্টাবুলারি (পিএসি) বাহিনী প্রায় ৫৬ জনকে ট্রাকে চাপিয়ে নিয়ে আসার পর রাতের অন্ধকারে ঠান্ডা মাথায় গুলি চালিয়ে ৪২ জনকে হত্যা করেছিল, কিন্তু এ বছরের ২১ মার্চ দিল্লীর তিস হাজরি সেশন কোর্টের রায়ে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে ১৬ জন অভিযুক্ত পুলিশকে বেকসুর খালাস দেওয়া হলো। দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে চলা এই কেসটিকে বলা যায় স্বাধীনতার পর পুলিশ হেফাজতে সব চেয়ে বড় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত মামলা।

পুলিশি হেফাজতে এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটে উত্তরপ্রদেশে, কংগ্রেস জমানায়। মীরাট জেলায় সাম্প্রদায়িক হানাহানি প্রায়শ হয়ে থাকে। ১৯৮৭ সালের ঘটনা। সামান্য ব্যাপার নিয়ে হাসিমপুরা মহল্লার বাসিন্দা মুসলমানদের সাথে পাশের মহল্লার হিন্দু বাসিন্দাদের গন্ডগোল শুরু হয়। ২১ মে কার্ফু জারি হয় আর ২২ মে সকালবেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনী হাসিমপুরা মহল্লা ঘিরে ফেলে আর তারপর প্রতিটি ঘর থেকে পুরুষদের টেনে বার করে এনে পিএসি বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারা নাকি ওদের স্থানীয় থানায় নিয়ে যাবে ট্রাকে চাপিয়ে। এরপর কেউ ফিরে আসেনি। ভুল হলো! তিনজন বেঁচে ফিরেছিল লুকিয়ে লুকিয়ে, তারা সারারাত মৃতদেহ সেজে শুয়েছিল 'হিন্দোন' খালের ধারে। খালের জলে বা ধারে পড়ে ছিল ৪২ জনের লাশ।

তিস হাজরি কোর্টের সেশন জজের অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ এই যে, মৃতদের আত্মীয় স্ত্রী পরিবার খুবই কষ্টে আছে, তাই তাদের কয়েকজনের অবশ্যই পুনর্বাসন দরকার! আরো অদ্ভুত এই যে অভিযুক্তরা সবাই হত্যাকাণ্ডে জড়িত হলেও সবাই জামিনে ছাড়া পেয়ে গিয়েছিল। কেন না তারা সবাই সরকারের অত্যন্ত অনুগত। ফলে তারা চাকরি করে গেছে নিরপরাধ নাগরিকদের মতই. যদিও ঐ পিএসি বাহিনীর বিরুদ্ধে এফআইআর দাখিল হয়েছিল ২৩ মার্চ ১৯৮৭ সালেই। কংগ্রেসিরা মুখে বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক বলে বক্তৃতাবাজি করলেও তারা নিজেরাই যে সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে অভ্যস্ত তা এই ঘটনায় প্রমাণিত। যেমন, ১৯৮৪ সালে শিখ বিরোধী দাঙ্গায় কংগ্রেসিরাই ঠান্ডা মাথায় দিল্লীতে ও সারা ভারতে প্রায় ৭০০০ জন শিখ হত্যা করেছিল। একই চরিত্র দেখা যায় অন্যান্য পার্টিগুলিরও, যারা নানা সময়ে মীরাটে এমএলএ বা এমপি হয়েছিল। যেমন বিজেপি, বিএসপি, কংগ্রেস সবাই। কারোর হুঁশ হয়নি পুলিশি হেফাজতে গণহত্যার নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদ করে অবিলম্বে বিচার চাওয়ার। যদিও বিচার চেয়ে সোচ্চার হয়েছিল কিছু 'অধিকার রক্ষা সমিতি', যেমন পিইউসিএল। ফলে ১৯৮৭ সালের ঘটনার চার্জশিট পেশ হল ১৯৯৬ সালে, গাজিয়াবাদের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। এর ৬ বছর বাদে এই কেসটি ২০০২ সালে দিল্লীর তিস হাজরি কোর্টে তোলা হয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। যদিও এর অনেক আগেই 'ইন্ডিয়ান পিপল্স হিউম্যান রাইটস্ কমিশন' একটি পিপলস্ ট্রাইবুন্যাল তৈরি করেছিল আরওয়াল গণহত্যা ও মীরাট গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে। তার চেয়ারম্যান সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার রিপোর্ট তৈরি করে জনসমক্ষে প্রকাশ করেন ১৯৮৯ সালের মে মাসে। এই রিপোর্টটি তিস হাজরি কোর্টের বিচারক হয়ত চোখেও দেখেননি, কিংবা সেটিকে সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেন নি। কীভাবে বিচার হবে! ১৯৮৭ সালের এফআইআর-এর যোগসূত্রে ২০০২ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তিস হাজরিতে ঐ কেস উঠলেও রাজ্য সরকারের বদান্যতায় স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটার নিযুক্ত হতে হতে ২০০৪ সাল। এর পর ২০০৬ সালে কেস শুরুর জন্য চার্জশিট ফাইল হলো, ২০১০ সালে হলো সাক্ষ্যগ্রহণ। এবং এইভাবে ২০১৫ সালে বিচারকের কাছে প্রমাণ হলো যে 'হত্যাকাণ্ডটা' ঘটেছিল, কিন্তু ঐ ১৯ জন (যাদের তিনজন ইতিমধ্যে মারা গেছেন) পিএসি-র লোকই যে গুলি চালিয়েছিল রাতের আঁধারে তা নাকি বোঝা যায় নি। অতএব 'বেনিফিট অফ্ ডাউট'-এ মুক্তি পেল সরকারি জল্লাদ বাহিনী!

এদেশে গণপ্রজাতন্ত্রের অবস্থা এমনই যে হাসিমপুরা হত্যাকান্ডের ২০ বছর পর ২৪ মে ২০০৭ সালে হত্যাকাণ্ডে উদ্ধার পাওয়া দুজন ও নিহত হওয়া ৩৬ জনের পরিবারের সদস্যরা লখনৌ গিয়ে ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের কাছে ৬১৫টি আবেদনে ঐ কেসের বিশদ অবস্থা জানতে আরটিআই অ্যাক্ট অনুসারে জমা দেন। জানা যায় যে সমস্ত অভিযুক্ত পুলিশেরাই তখনও চাকরিতে বহাল ছিল এবং তাদের কনফিনডেশিয়াল রিপোর্টে কখনো তাদের উপর অভিযোগ নিয়ে কোন কথাই লেখা হয়নি। পাকাপোক্ত কাজ করা হয়েছিল ঐ হত্যাকাণ্ডকে মুছে ফেলতে! ঘটনার সাক্ষ্য হিসাবে মিলিটারি বাহিনীর কার্যকলাপের অজস্র ফটো কোর্টের কাছে পেশ করা হলেও বিচারক যথেষ্ট প্রমাণ পান নি। তাই দোষী সাব্যস্ত হয় নি সিআইডি কর্তৃক অভিযুক্ত পিএসি বাহিনীর ১৯ জন!

গত ২১ মার্চ তিস হাজরি কোর্টে এই রায় ঘোষণার পর দিল্লীতে 'জাস্টিস ফর হাসিমপুরা কমিটি' নামক সংগঠন নিহত মানুষদের পরিবারের লোকজন, উদ্ধার পাওয়া তিনজন ও তাদের উকিলরা এবং অধিকার সচেতন নাগরিকদের নিয়ে ২৪

মার্চ একটি কনভেনশন করে। কনভেনশন থেকে পুনরায় এই গণহত্যার সুবিচারের প্রস্তাব নেওয়া হয়।

হাসিমপুরার এই কাস্টোডিয়াল হত্যাকাণ্ডের বিচারের রায় আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিহারের আরওয়াল জেলার লক্ষ্মণপুর-বাথে গ্রামের ৫৮ জন দলিতের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তদের পাটনা হাইকোর্টে বিচারের কথা। ১৯৯৭ সালের ঘটা এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত রণবীর সেনার ১৬ জনকে পাটনা সিভিল কোর্ট ২০১০ সালে মৃত্যুদণ্ড আর ১০ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেও ২০১৩ সালে পাটনা হাইকোর্ট ঐ রায় বদলে যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে সব অভিযুক্তদের 'বেনিফিট অফ ডাউটে' মুক্তি দেয়! একই ব্যাপার! হত্যাকান্ড ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু প্রমাণ কই? চলতি শাসনব্যবস্থায় নিম্নবর্গের দরিদ্র মানুষ বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা এই দেশকেই জন্মভূমি বলে জানত, তারা তাদের অ-মূল্য জীবন হারায় কখনো পুলিশের হাতে, কখনো উচ্চবর্গের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে। এবং বিচারে উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে 'বেনিফিট অফ্ ডাউটে' সব অভিযুক্তরাই মুক্ত হয়ে যায়। ফলে 'জাস্টিস ডিলেইড জাস্টিস ডিনায়েড' শুধু নয়, নিম্নবর্গের মানুষদের সুবিচার পাওয়াই দায়। এদেশে বিচারব্যবস্থায় সুবিচার সংরক্ষিত আছে শুধু উচ্চবর্গ মানুষদের জন্য বা শাসক শ্রেণী ও উচ্চবর্গের নাগরিকদের নিরাপত্তা রাখার দায় বহন করে যারা, সেই পুলিশ বাহিনীকে রক্ষার জন্য!

বিহারে দলিত হত্যাকাণ্ডে
উচ্চবর্ণের লোকরা ছাড় পেয়ে যাচ্ছেন প্রমাণাভাবে বা অনির্ভরযোগ্য সাক্ষীর কারণে

হত্যাকাণ্ডের বছর	ঘটনা	নিহত দলিতদের সংখ্যা	যে আদালত ছেড়ে দিয়েছে	কবে ছাড়া পেয়েছে
১৯৯৬	বাথানিটোলা	২০	পাটনা হাইকোর্ট	এপ্রিল ২০১২
১৯৯৭	লক্ষণপুর বাথে	৫৮	পাটনা হাইকোর্ট	অক্টোবর ২০১৩
১৯৯৮	নাগরি বাজার	১০	পাটনা হাইকোর্ট	মার্চ ২০১৩
১৯৯৯	শংকরবিঘা	২৩	জেহানাবাদ ট্রায়াল কোর্ট	জানুয়ারি ২০১৫
২০০০	মিয়াপুর	৩২	পাটনা হাইকোর্ট	জুলাই ২০১৩

'কর্পোরেট কর্জা মাফি' ও হাঙরের উল্লাস

শ্যামল দাস

৯ এপ্রিল ২০১৫ *দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া* কাগজে একটি খবর প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় কর্পোরেট কুলপতিরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডাকে সাড়া দিয়ে গ্যাসের ভর্তুকি ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। অর্থাৎ তাঁরা এবার থেকে বাজার মূল্যে গ্যাস কিনবেন। এঁরা হলেন আনন্দ মহিন্দ্রা, অনিল আগরওয়াল, সজ্জন জিন্দল, গৌতম আদানি, উদয় কোটাক, বায়োকনের সিইও কিরণ মজুমদার শা ইত্যাদি। এমনকি একধাপ এগিয়ে অনেকেই তাঁদের কর্মচারীদের প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিতে বলেছেন। পিছিয়ে নেই আম্বানিরাও। মুকেশ আম্বানি তার রিলায়েন্স গ্রুপের কর্মীদেরও প্রধানমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। দেশ গঠনের কাজে 'কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান'-এর কর্পোরেট কুলপতিদের উৎসাহের আসল কারণ 'অন্য কোথা অন্য কোন খানে'।

১২২ কোটি ভারতীয় জনগণের প্রথম ১ বা ২ শতাংশ গ্যাসের ভর্তুকি ছেড়ে দিয়ে মহৎ কার্য করিলেন বটে। আমরা ইতিহাসে পড়েছি, তিন বছর অন্তর এক দিন রাজা হর্ষবর্ধন ও তাঁর ভগ্নী পরনের কাপড় ছাড়া তাঁদের সম্পদের সবটাই নাকি গরিব-দুঃখীদের দান করতেন। যদিও ইতিহাসে ঐ একদিন বাদে দু'বছর তিনশত চৌষট্টি দিনের লুঠের কোন বর্ণনা নেই। বিংশ শতাব্দীর দু'জন দার্শনিক-রাজনীতিক যে লুঠকে বলেছিলেন 'ওরিয়েন্টাল ডেসপটিজ্‌ম'।

যাই হোক, ২০১৫-১৬ বাজেটে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর অর্থমন্ত্রী জেটলি সাহেব কর্পোরেট লুঠের নতুন কী বন্দোবস্ত করলেন তার দিকে একটু নজর দেব। যে সমস্ত 'আম-আদমি' সোনা-হিরের গহনা কেনেন তাঁদের জন্য ৭৫,৫৯২ কোটি টাকার কাস্টম্‌স ডিউটি ছাড় দেওয়া হয়েছে। এতে লাভবান হবেন টাটার তানিশ্‌ক, রিলায়েন্সের গয়না ব্যবসা থেকে শুরু করে সুরাট-পোরবন্দর-ভাবনগরের সোনা-হিরের ব্যবসায়ীরা।

এবছর *এনরেগা*-র (NREGA) জন্য ধার্য হয়েছে ৩৪,৪৯৯ কোটি টাকা। এর থেকে গত বছরের বকেয়া ৬০০০ কোটি টাকা (যা রাজ্যগুলির প্রাপ্য আছে ২০১৪-১৫ বাবদ) বাদ দিতে হবে। বাস্তবে *নরেগা*-র জন্য ধার্য হয়েছে বিগত অর্থবর্ষের চেয়েও কম টাকা। গত অর্থ বর্ষের চেয়ে এবারে কৃষিতে ৫০০০ কোটি টাকা কম ধার্য্য হয়েছে। আরও আছে। কর্পোরেট ত্রাণ তহবিলের ৪২ ট্রিলিয়ন টাকা, অর্থাৎ ৪২ লক্ষ কোটি টাকা। যার মধ্যে এ বছরের ধার্য ত্রাণের পরিমাণ হলো ৫,৮৯,২৮৫ কোটি টাকা। আর তাদের আয়কর ছাড় দেওয়া *হচ্ছে* ৫.৪৯ লক্ষ কোটি টাকা। আর এই রকম বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ধরনের কর্পোরেট ইনসেনটিভ যোগ করলে মোট অঙ্কটা দাঁড়াবে ৪২ লক্ষ কোটি টাকা। এটা অবশ্য গত দশ বছরের হিসেব। সময়কাল ২০০৫-০৬ অর্থবর্ষ থেকে ২০১৪-১৫। জনসংখ্যার তলার দিকের ৭০-৮০ শতাংশকে ত্রাণ দিলে বলা হয় ভর্তুকি। আর জনসংখ্যার প্রথম ১০ শতাংশকে ত্রাণ দিলে বলা হবে উৎসাহ ভাতা। তা উৎসাহ ভাতা কিসের জন্য? আরও লুঠের জন্য। অঢেল লুঠ যদি করতে না দেওয়াই হয়, ত্রাণ যদি না দেওয়াই হয়, তবে সাগরপারের গচ্ছিত কালো টাকা ফিরবে কী ভাবে?

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এবারের বাজেটের 'কর্জা মাফি' ২০০৫-০৬ অর্থবর্ষের তুলনায় ১৪০ শতাংশ বেশি। গত বছর পর্যন্ত এই 'কর্জা মাফি'কে বলা হতো কর্পোরেট করদাতাদের জন্য আদায়িকৃত করের ব্যয় (major tax expenditures on corporate taxpayers)। কর্পোরেট করদাতাদের জন্য ব্যয়? ক্রোড়পতিদের জন্য সরকারি সাহায্য? শুনতে খারাপ লাগে না! লুটেরা বলে কি মান-সম্মান নেই! এবারের বাজেটে জেটলি সাহেব এই ব্যয়ের নতুন নামকরণ করছেন কর্পোরেট করদাতাদের জন্য উৎসাহ ভাতা (revenue impact of major incentive on corporate taxpayers)। সুতরাং ৫.৪৯ লক্ষ কোটি টাকার কর্পোরেট 'কর্জা মাফি'-কে ভারতের ধনীশ্রেষ্ঠদের জন্য জনসাধারণের টাকায় দেদার ফুর্তি-বেলেল্লাপনার জন্য সরকারি ভর্তুকি বলা যাবে না। বলতে হবে উৎসাহ ভাতা। বে-লাগাম কর্পোরেট লুট জারি রাখার জন্য 'উৎসাহ ভাতা' বা 'ইনসেনটিভ'।

মোদি সরকারের অর্থমন্ত্রী জেটলি সাহেব গত বছর বলেছিলেন এনডিএ সরকার অতীতের 'ভর্তুকি রাজ' আর ফেরাবে না। ২০১৩-১৪-র বাজেটে মনমোহন সরকার কর্পোরেট আয়কর মাফ করেছিলেন ৫৭,৭৯৩ কোটি টাকা। মোদি সরকারের প্রথম বাজেটেই কর্পোরেট আয়কর বাবদ 'কর্জা মাফি' করা হয়েছে ৬২,৩৯৯ কোটি টাকা। গরিবগুর্বোদের খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বা *এনরেগা*-র জন্য টাকা ধার্য হলে সেটা ভর্তুকি। আর কর্পোরেট-গরিবদের হাজার হাজার কোটি টাকা আয়কর ছাড় দিলে সেটা হয় 'উৎসাহ ভাতা'। 'আর কইয়েন না কর্তা, ঘুড়ায় হাসব'। শুধুমাত্র ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে কর্পোরেট আয়কর ছাড়ের পরিমাণ ঘণ্টায় ১৭১ কোটি টাকা, বা মিনিটে ৭ কোটির টাকার বেশি। সরকারের অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম সাহেব ছিলেন 'ভর্তুকি'-র (পড়ুন গরিবদের জন্য ভর্তুকি) বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। আর বর্তমান অর্থমন্ত্রী সেটা করে দেখাচ্ছেন। মনে হয় গোটা নকশাটাই তৈরি হয়েছে দুজনের যোগসাজসে কর্পোরেটদের স্পনসরশিপে।

এই ৪২ লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে বর্তমান হারে *এনরেগা* চালানো যেত ১২১ বছর ধরে। আর খাদ্য নিরাপত্তা (বর্তমান হারে) ব্যয় চালানো যেত ৩৪ বছর ধরে। এসব এখন বলা বারণ, লেখা বারণ। আম আদমির একটাই কাজ। অচ্ছে দিনের জন্য অপেক্ষা করা আর মোদি-জেটলির কর্পোরেট ভজনার কোরাসে সামিল হয়ে গীতার বাণী অনুযায়ী কর্মফলের জন্য অপেক্ষা করা।

শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ ক্রমশ কমতির দিকে। সেন্টার ফর চাইল্ড রাইটস্-এর মতে — "শিশুদের স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ শতকরা ২২ ভাগ কমানো হয়েছে" আর "শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে শিশুদের সার্বিক শিক্ষা বাবদ বরাদ্দ"। কোন্ ধরনের অর্থনৈতিক বর্গের শিশুরা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তা পাঠকের অজানা নয়।

২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত কর্পোরেটদের বিভিন্ন খাতে মকুব করা করের পরিমাণ ৪.৩ লক্ষ কোটি টাকা। যা কিনা কাজে লাগানো যেত শিশুদের জন্য শিক্ষা খাতে বা গর্ভবতী মায়েদের, দারিদ্র্যপীড়িত মেয়েদের স্বাস্থ্য খাতে, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায়। যা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি করা যেত স্থায়ী সামাজিক সম্পদ। শহরের বস্তি, ঝুপ্পি-ঝুপড়িগুলিতে ব্যবস্থা করা যেত পানীয় জলের ও বৈজ্ঞানিক পয়ঃপ্রণালী বা বর্জ নিষ্কাশনের। সে পথে হাঁটেনি গত ইউপিএ সরকার বা 'অচ্ছে দিন' নিয়ে আসতে অঙ্গীকারবদ্ধ মোদি সরকার।

৪২ লক্ষ কোটি টাকাই হোক বা কর্পোরেট কর ছাড়ের ৪.৩ লক্ষ কোটি টাকাই হোক— সরকারি বদান্যতায় কর্পোরেট লুঠের হিসাবের এ *হচ্ছে* হিমশৈলের চূড়া। নন পারফরমিং অ্যাসেট অর্থাৎ সরকারি ব্যাংক থেকে ধার নেওয়া টাকার কোন হিসাবই করা হয়নি। সম্প্রতি লাটে ওঠা বিজয় মাল্যর বিমান সংস্থার ১০ হাজার কোটি টাকা যে আদৌ উদ্ধার করা যাবে না, সেটা একটা শিশুও বোঝে। ধনী লোকেরা কত টাকা সরকারি ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে বসে আছে তা ব্যাঙ্কগুলি প্রকাশ করতে বাধ্য নয় "সিক্রেসি ল"-এর অজুহাতে। সম্প্রতি অর্থ দফতরের প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত সিনহা এক প্রশ্নের উত্তরে পার্লামেন্টে জানিয়েছেন, নন পারফরমিং অ্যাসেটের পরিমাণ গত কয়েক বছরে ছিল ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি। এছাড়া কর্পোরেট ডেট রিস্ট্রাকচারিং-এর নামে আরও বেশি পরিমাণ কর্পোরেট ঋণ মকুব করা হয়েছে। এছাড়াও আছে হাজার হাজার একর জমি, যা আদানি-আম্বানি-টাটা-মিত্তাল ইত্যাদিরা *সেজ*-এর নামে কম

দামে কিনে রেখেছেন। *সেজ* বাতিল হলেও, প্রস্তাবিত শিল্পের জন্য একটা ইট গাঁথা না হলেও জমির মালিকানা রয়ে যাচ্ছে কর্পোরেট কুলপতিদের হাতেই।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর ভর্তুকিহীন গ্যাস ব্যবহারের শ্লোগানে এই কর্পোরেটকুল যে ধুয়ো ধরবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। স্বেচ্ছায় গ্যাসের ভর্তুকি ছেড়ে দেবার জন্য সরকার এখনও পর্যন্ত রাজকোষে বাঁচাতে পেরেছে ১০০ কোটি টাকা। ২০১৫-১৬ বাজেট প্রস্তাবে গ্যাসের ভর্তুকি বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০,০০০ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থ বর্ষে একই খাতে ব্যয় হয়েছিল **৪০,০০০** কোটি টাকা। পাঠক বিচার করবেন, ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত কর্পোরেট 'কর্জা মাফি'-র ৪২ লক্ষ কোটি টাকার সঙ্গে গ্যাসের ভর্তুকির তুলনা করার নেপথ্য কারণ।

জুন ২০১১ থেকে করপোরেট 'কর্জা মাফি' (corporate debt restructuring বা CDR) বেড়েছে লাফিয়ে লাফিয়ে। করপোরেট 'কর্জা মাফি'র জন্য বিভিন্ন সরকারি ব্যাঙ্কের ফোরাম বানানো হয়েছে। এই ফোরামের কাছে করপোরেট বর্গ 'কর্জা মাফির' প্রস্তাব পেশ করেন। টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ৯ জানুয়ারি, ২০১৪ 'কর্জা মাফি'-র জন্য করপোরেট প্রস্তাবের একটি তালিকা প্রকাশ করে। তালিকাটি নিম্নরূপ :

মাস	CDR-এর প্রস্তাব প্রতি ত্রৈমাসিক (কোটি টাকা)
জুন ২০১১	৪৫৯৫
সেপ্টেম্বর ২০১১	২১০৯৫
ডিসেম্বর ২০১১	১৮৩১৭
মার্চ ২০১২	২৩৪৪২
জুন ২০১২	২০৫২৮
সেপ্টেম্বর ২০১২	১৮৯০৭
ডিসেম্বর ২০১২	২০৯৫৭
মার্চ ২০১৩	৩১১০৫
জুন ২০১৩	৩৯৫২১
সেপ্টেম্বর ২০১৩	২৪৮৫৯
ডিসেম্বর ২০১৩	৪৪৬৩০

এর সাথে যুক্ত করতে হবে ব্যাঙ্কগুলির নন-পারফরমিং অ্যাসেটের বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি। ২০১৩ সেপ্টেম্বর মাসে যার পরিমাণ ছিল ২.৩ লক্ষ কোটি টাকা। যে পরিমাণে করপোরেট 'কর্জা মাফি'র প্রস্তাব ব্যাঙ্কগুলির কাছে জমা পড়ছে ও গৃহীত হচ্ছে, তাতে একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে অচিরে ব্যাঙ্কের ভাঁড়ারে টান পড়বে। এপ্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গর্ভনর কে সি চক্রবর্তীর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে— "What we are saying is that CDR should not be done only to keep assets strengthened. CDR should be done if the assets can have a full life and banks can recover the dues. We have nothing against CDR. Secondly, why small stake holders are not getting the benefits is the question... We are not saying that re-structuring should not be there."

করপোরেটকুল ব্যাঙ্ক থেকে ধার নিল। কার টাকা? জনগণের গচ্ছিত টাকা যা ব্যাঙ্কে রাখা আছে। করপোরেটকে কে ধার দিল? সরকার, ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট। ধার নেবার পর টাকাটা কি সুনামিতে ভেসে গেল? শিল্পস্থাপনের পর্বে লোহা, সিমেন্ট, কারিগরি পরিকল্পনা ও রূপায়ণের জন্য ব্যয় হ'ল। অর্থাৎ আরেক করপোরেটের ব্যবসা বাড়ল বা সেই করপোরেট অধীন কোন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বাড়ল। তারপর শিল্পটি চলল না বা চালানো হ'ল না বা পরিকল্পনার গোড়ায় গলদ ছিল বা গলদ রাখা হয়েছিল। অতএব, করপোরেট 'কর্জা মাফি'-র প্রস্তাব জমা পড়ল CDR সেলের কাছে। অন্যদিকে ৪০ বা ৫০ হাজার টাকা ধার নিয়ে চাষে লোকসান হল কৃষকের। অতএব আত্মহত্যা। কারখানা বন্ধ বা অবসরের পর কোম্পানী ভবিষ্যনিধি বা গ্রাচুইটির টাকা দিচ্ছে না। অতএব, আত্মহত্যা। ভারতীয় গণতন্ত্রে সবার অধিকার সমান। শুধু করপোরেট বর্গ ছাড়া।

(ব্যবহৃত তথ্যগুলি The Times of India, 09/4/15, 9/1/2014 এবং Outlook, মার্চ ২৩, ২০১৫-র P. Sainath-এর লেখা থেকে নেওয়া।)

স্মরণ

সত্তরের দশকের কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মী *পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়* সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। "ম্যানিফেস্টো" পত্রিকার প্রাণপুরুষ পার্থ অনেক কবিতাগ্রন্থ লিখেছেন, সম্পাদনা করেছেন (যেমন "ফুল ফুটুক") —নির্মাণ করেছেন গণসঙ্গীত সংস্থা "গণবিষাণ"। *অনীক* তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে।

একই সঙ্গে আমরা হারালাম লাতিন আমেরিকার লেখক-সাংবাদিক *এডুয়ার্ডো গ্যালিয়ানোকে*। লাতিন আমেরিকাকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে প্রকাশ্যে আনা, ব্যবসার নামে লুণ্ঠন, অত্যাচার, অনাচার আর শোষণের যে ইমারত গড়ে তুলেছিলো ইউরোপের ধনতান্ত্রিক সমাজ— লাতিন আমেরিকার সমাজকে সেই শোষণ-অত্যাচার কেমনভাবে রক্তশূন্য করে মৃত্যুপথযাত্রী করে তুলেছিলো, তারই বিবরণ দিয়েছেন গ্যালিয়ানো। তাঁর সাহিত্যকর্ম, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নিপীড়িত দুনিয়ার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে চলবে বহুদিন। *অনীক* তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে।

প্রবন্ধ

ওবামার সফর ও নিউক্লিয়ার চুক্তি

সমরেশ মিত্র

জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির এক সময়কার অবিসংবাদিত নেতা ভারত এখন জোট নিরপেক্ষতার কোনরকম প্রচেষ্টা বিসর্জন দিয়ে ইরাক, লেবানন, গাজা ভূখণ্ডে মার্কিন হানাদারির সমর্থকে পরিণত হয়েছে। ভারত মেনে নিয়েছে প্রত্যক্ষ মার্কিন নিয়ন্ত্রণ, যার অন্যতম প্রকাশ ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি।

ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি : ফিরে দেখা

ভারতের মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ীকুল দালালির জন্য যখন একদিকে নতুন প্রভুর খোঁজে আকুল, সেই একই সময়ে তারা ইউপিএ-র বদলে এনডিএ-কে বেছে নিলো। মার্কিন দেশের ব্যবসায়ীরাও তখন মন্দা সামাল দেওয়ার জন্য নতুন নতুন অংশীদার, নতুন নতুন বাজার এবং নতুন নতুন দালালের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

নতুন ক্ষেত্র হিসেবে উঠে আসে নিউক্লিয়ার শক্তি, সামরিক সরঞ্জাম এবং নতুন প্রক্রিয়া হিসেবে আবির্ভূত হয় দ্বিপাক্ষিক চুক্তি।

বাজপেয়ী প্রদর্শিত পথে মনমোহন

ভারত-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তি সম্পাদনা ক'রে ভারতকে মার্কিন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির মৃগয়াক্ষেত্র করে তোলা হয়েছে। 'রুটি-হালুয়া'-র কামড়াকামড়িতে যাতে যথার্থ প্রভুভক্তরাই সব বরাতগুলো পায় তার জন্য একদিকে ওয়াশিংটন অন্যদিকে ভারতের ব্যবসায়ীদের সংগঠনগুলি জলের মতো অজস্র অর্থব্যয় করে। দু-চারটে উদাহরণ দেওয়া যাক। যেমন, ভারতে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূতদের সংস্থা, 'বার্বার, গ্রিফিথ্স এবং রজারস্', যাদের কাজ হল ভারতের সাংসদ এবং মার্কিন সেনেটরদের উৎকোচ এবং নানাবিধ বৈধ-অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে দুদেশের সমাজে মতামত নির্মাণ করা, তাদের নিয়োগ করে এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পক্ষে সহমত তৈরি করা।

প্রথম ধাক্কাতেই এই সংস্থাটি মার্কিন দেশ এবং ভারতের ব্যবসায়ীদের সংগঠন, কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ-এর পক্ষে এই ধরনের কাজের জন্য ১৩ লক্ষ মার্কিন ডলারের বরাত পায়।

বৈধ-অবৈধ সুবিধার মধ্যে ছিল দুদেশের সাংসদ-সেনেটর, দুদেশের আইন কমিশনের সদস্যদের দুদেশ ভ্রমণের খরচ জোগানো। বস্তুত ২০০০ থেকে ২০০৫-এর মধ্যে এই ভ্রমণ খাতে কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজ প্রায় পাঁচ লক্ষ মার্কিন ডলার ব্যয় করে। বলাই বাহুল্য, ২০০৬ সালে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এই চুক্তির মূল বিষয় যে ভারতকে শক্তিক্ষেত্রে এবং সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির ক্ষেত্রে মার্কিন দেশের মৃগয়াভূমি করে তোলা, তা বোঝা যায় যখন আমরা মার্কিন-ভারত বিজনেস কাউন্সিল-এর আহ্লাদিত বিবৃতি দেখতে পাই। বিবৃতির মূল কথা— শক্তি এবং সামরিক ক্ষেত্রে ২০২০ সালের মধ্যে ভারত যে ২০০০ থেকে ৪০০০ কোটি ডলার বিদেশি পণ্য কিনতে ব্যয় করবে, তার সিংহভাগেরই বরাত পাবে মার্কিন সংস্থাসমূহ, যারা এই ভারত-মার্কিন বিজনেস কাউন্সিল-এর সদস্য! যেমন যুদ্ধবিমান নির্মাণ সংস্থা লক্হীড-মার্টিন (যে সংস্থা থেকে বাবা বুশ তার পেনশন পান) আগামী এক দশকে ভারতকে ৯০০ কোটি মার্কিন ডলারের যুদ্ধবিমান বিক্রি করবে।

ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত হিসেবে অন্যদিকে শক্তিক্ষেত্রে ভারত সরকার তখনই ঠিক করেছিল যে, ২০০৫-০৬ সালের সময়কালে সমগ্র বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ শক্তির যে ২.৫ শতাংশ নিউক্লিয়ার উৎস থেকে উৎপাদন করত, তা বাড়িয়ে ২০৩১ সালের মধ্যে ৮০০ গিগাওয়াট করবে। অর্থাৎ প্রতিবছর ভারত ৭-৮ শতাংশ করে সমগ্র বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে নিউক্লিয়ার উৎস থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়াবে। ২০০৬ সালে উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩.৩ গিগাওয়াট, তা ২০১২ সালে বাড়িয়ে করা হবে ১০ গিগাওয়াট এবং ২০২০ সালে তা আরও বেড়ে দাঁড়াবে ২০ গিগাওয়াট। যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই সংযুক্তি এবং বৃদ্ধি ঘটবে ক্রমাগত ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এক একটি চুল্লি প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে দু'দশকে লাগবে ৪০টি নতুন চুল্লি বা বছরে গড়ে দুটি করে নতুন চুল্লি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। স্বভাবতই এর সিংহভাগ বরাত পাবে মার্কিন কোম্পানিগুলি, যারা গত ৩০ বছরে কী অভ্যন্তরীণ বাজার, কী আন্তর্জাতিক বাজার, কোথা থেকে একটিও নতুন বরাত জোটাতে পারেনি!

ওবামার ভারত বিজয় : ২০১৫

নিউক্লিয়ার বিষয়ে ভারত-মার্কিন যে সমঝোতার শুরু হয়েছিল ১৮ জুলাই ২০০৫, সেটি মোটের ওপর রূপায়ণযোগ্য অবস্থায় পৌঁছায় যখন মার্কিন সেনেট ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৮-এ ১২৩-সমঝোতাকে মঞ্জুর করে। যে দ্রুততায় ভারতকে মার্কিন দেশের শক্তি ব্যবসায়ীদের জন্য অবারিত দ্বার 'মুক্ত বাণিজ্য'-র স্বর্গে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, ভারতের জন-আন্দোলনের চাপে এবং ইউপিএ-২ সরকারের নড়বড়ে অবস্থার জন্য সেটি মনমোহন সরকার সেই দ্রুততায় করে উঠতে পারেনি। বস্তুত ঠিক তখনই ইউপিএ-২ সরকারের মৃত্যু-ঘণ্টা

Unfiled Notes Page 9

বাজতে শুরু করে। যাওয়ার আগে অবশ্য তারা এদেশের বিভিন্ন ব্যবসায়ী লবি-র চাপে এবং বিশেষত গণআন্দোলনের চাপে নিউক্লিয়ার শক্তি উৎপাদকদের জন্য একটি আর্থিক দায়বদ্ধতার বিল ভারতের সংসদে পাশ করিয়ে তাকে আইনের রূপ দেয়।

দেশি-বিদেশি পুঁজি, বিশেষত যে মার্কিন ব্যবসায়ী লবিকে বিপুল সুবিধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোদী দিল্লির মসনদ দখল করেন তারা এরপর মোদীকে মসনদে আসীন করার প্রতিদান চাইতে থাকে। প্রধান যে দুটি লবি মোদী সরকারের ওপর বিপুল চাপ সৃষ্টি করে তারা হল নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ চুল্লি উৎপাদক লবি এবং সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদক লবি। দুটি ক্ষেত্রেই ভারতের প্রচলিত আইন বাধা হিসেবে উপস্থিত হয়। আইনি বাধা অতিক্রম করার একটি পথ ইন্দিরা গান্ধী বহু পূর্বেই প্রদর্শন করেছেন— বেআইনি কাজকে আইনে পর্যবসিত করা। বস্তুত এই পথটি এতই পরিচিত এবং পরীক্ষিত পথ যে নেহেরু-পরিবার-উদ্ভূত এই পথটি গ্রহণে সংঘ-পরিচালক মোদীরও অরুচি হয়নি।

প্রথমে তিনি ভারতের সংসদে স্রেফ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই (রাজনৈতিক বিজ্ঞানের পরিভাষায়, 'ব্রুট মেজরিটি') সামরিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে বেসরকারি লগ্নির ছাড়পত্র জোগাড় করলেন। কিন্তু গোল বাধালো ইউপিএ-২-র তৈরি করা 'আপদ'—নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা আইন, ২০১০। এই আইনমতে, সরবরাহকারী সংস্থার সরবরাহ করা নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ চুল্লি, বা যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রের নক্সার ত্রুটির ফলে যদি নিউক্লিয়ার চুল্লির দুর্ঘটনা ঘটে, তবে এই আইন প্রয়োগ করে সেই দেশি বা বিদেশি সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে এদেশে বা ক্ষেত্রবিশেষে বিদেশেও মামলা করা যাবে। মার্কিন দেশ সহ বিভিন্ন দেশের সরকার ও সেসব দেশের বেসরকারি অসামরিক নিউক্লিয়ার সরঞ্জাম সরবরাহকারী সংস্থাগুলি এই ধারাটির প্রবল বিরোধিতায় নেমে পড়ে। এদের সঙ্গে যোগ দেয় ঐ সমস্ত বিদেশি সংস্থার উচ্ছিষ্টভোজী বেশ কিছু ভারতীয় ফড়ে এবং মুৎসুদ্দি সংস্থা। অনেক দেশ এবং সেইসব দেশের বেসরকারি সংস্থাগুলি এবার আন্তর্জাতিক আইন এবং বিধিসমূহের ভক্ত সেজে বলে যে এই বিষয়ে যে আন্তর্জাতিক আইন— যার গালভরা নাম কনভেনশন ফর সাপ্লিমেন্টারি কনপেনসেশন ফর নিউক্লিয়্যার ড্যামেজ— সেই আইন মতে দুর্ঘটনার যাবতীয় দায় যে চুল্লি চালাচ্ছে তার, সরবরাহকারীরা বেকসুর খালাস!

মোদীর পক্ষে এসব আবদার মেনে নেওয়া সহজ হতো, কিন্তু ইতিমধ্যে ভূপাল দুর্ঘটনার মৃত্যু মিছিল অব্যাহত এবং ডাও কেমিকালের হয়ে রতন টাটা যতই সওয়াল করুন না কেন, ক্ষতিপূরণ আদায়ের আন্দোলন আজও অব্যাহত। ২০১১-র ফুকুসিমা নিউক্লিয়ার চুল্লির দুর্ঘটনা দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি পুনরায় জনসমক্ষে হাজির করে। ভোটের কথা ভেবে ইউপিএ-২ সরকার এই দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি কমিয়ে দিতে সাহস করেনি, কিন্তু বিপুল সদস্য নিয়ে লোকসভাতে জিতে আসা বিজেপি সে বিষয়ে যথেষ্ট 'সাহসী'। ফলে সামরিক সরঞ্জাম এবং নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা সাপেক্ষে বিপুল লগ্নি এবং সেই লগ্নির সঙ্গে সংযুক্ত কিক্-ব্যাক তাদের চাই।

অতএব রাজত্বে অভিষিক্ত হয়েই মোদী মক্কা, অর্থাৎ মার্কিন দেশের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সেখানে আলোচনা কালে দুপক্ষই একটি কনট্যাক্ট গ্রুপ বা একটি যোগাযোগ গোষ্ঠী নির্মাণে একমত হন, যার উদ্দেশ্য হলো "to realise their shared goal of delivering electricity from U.S.-built nuclear power plants to India" অর্থাৎ মার্কিন দেশে নির্মিত নিউক্লিয়ার চুল্লি বসিয়ে ভারতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যৌথ লক্ষ্য রূপায়িত করাই এই 'যোগাযোগ গোষ্ঠী'-র কাজ হবে। এই গোষ্ঠীর সদস্যরা হলেন ভারত এবং মার্কিন দেশের উচ্চপদস্থ আমলাবৃন্দ এবং অবশ্যই দুদেশের এই ক্ষেত্রের ব্যবসার মুখিয়ারা। ২০১৫-র জানুয়ারিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার সফরের আগে এই যোগাযোগ গোষ্ঠী দুবার মিলিত হয়ে ভারতে মার্কিন সংস্থার দ্বারা নির্মিত নিউক্লিয়ার চুল্লি বসানোর বিষয়টি মসৃণ করতে তৎপর হয়।

এর আগেই অবশ্য মার্কিন নিউক্লিয়ার চুল্লি নির্মাণ সংস্থা, ওয়েস্টিংহাউস এবং জেনারেল ইলেকট্রিক, গুজরাতের মিথি ভিরদিতে একটি এবং অন্ধ্রপ্রদেশের কোভাড়াতে একটি করে নিউক্লিয়ার চুল্লি বসানোর বরাত পেয়ে বসে আছে। কিন্তু ভারতের নিউক্লিয়ার শক্তি নিগমের সঙ্গে ওয়েস্টিংহাউস প্রাথমিক আলোচনার পর আর বাণিজ্যিক স্তরে আলোচনা চালাচ্ছে না। তারা যে দুটি বিষয়ে ফয়সালা চায় (মার্কিন দেশ সহ বিভিন্ন দেশের সরকার অথবা সেসব দেশের যে বেসরকারি সংস্থাগুলি ভারতে নিউক্লিয়ার চুল্লি বসাতে উন্মুখ তারাও চায়) সেগুলি হলো— (ক) নিউক্লিয়ার চুল্লির দুর্ঘটনা জনিত দায়বদ্ধতা কাদের এবং তার আর্থিক পরিমাণ কতটা; (খ) মার্কিন দেশ ভারতকে যে সমস্ত বিভাজনক্ষম বস্তু সরবরাহ করবে সেগুলি ভারতের কোথায় কোথায় কী কী পরিমাণে কী কী খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে তার নিখুঁত হিসেব রাখার প্রশাসনিক প্রক্রিয়া।

বিভিন্ন রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে যে ভারতের নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনার দায়বদ্ধতার আইন পরিবর্তন করা যাবে না, তা অনুধাবন করে মোদী সরকার, ওবামার ভারত সফরের আগেই এই আইনকে এড়িয়ে গিয়ে, এর দায়বদ্ধতার দিকটি শিথিল করে কী করে মার্কিন ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে এই ক্ষেত্রটিকে লগ্নির বিষয়ে আশ্বস্ত করা যায় তার ফিকির খুঁজতে থাকে।

বিদেশি সংস্থার দায়বদ্ধতা যদি কোনোভাবে ভারতের

কোনো বিমা সংস্থার ঘাড়ে চালান করা যায়, তবে ভারতের করদাতা জনগণের টাকায় বিদেশি বানিয়াদের দায় বহন করার ব্যবস্থা করা যায়। (ঠিক যেমন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের সময়, ইংল্যান্ডের যুদ্ধের দক্ষিণাস্বরূপ ভারতের জনগণকে 'হোম চার্জ' দিতে হত এবং তৎকালীন আরএসএস এই প্রক্রিয়ার সবচেয়ে উৎসাহী সমর্থক ছিল।) অতএব ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থা জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি (স্বভাবতই কোনো বেসরকারি বিমা সংস্থাকে এতে রাজি করানো যায় নি) এই মর্মে এই প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে, যাতে চুল্লির খুঁতের জন্য দুর্ঘটনা ঘটলে সরবরাহকারীর হয়ে এই বিমা কোম্পানিটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থাকে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবে!

বিভাজনক্ষম বস্তুর নিরাপত্তা নিয়ে ভারত সরকার বলেছে যে অতীতে যেমন কানাডাকে বলা হয়েছিল যে আন্তর্জাতিক এ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সির দেওয়া সার্টিফিকেটকেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত মানতে হবে, যা কানাডা মেনে নিয়েছে এবং ওয়েস্টিংহাউস সংস্থাও মানে, বর্তমানে মার্কিন সরকারকেও তা মেনে নিতে হবে—এ বিষয়ে ভারত সরকার কোনো উদ্যোগই নেবে না। মার্কিন দেশ তার ব্যবসার বহর ও পরিসর দেখে বিষয়টিতে নিমরাজি হয়েছে।

এই দুটি বিষয়ে ভারতের পক্ষে মোদী এবং মার্কিন দেশের পক্ষে বরাক ওবামা মোটাদাগের সহমতে পৌঁছোন এই বছর (২০১৫) প্রজাতন্ত্র দিবসে। সঙ্গে সঙ্গে এদেশে এবং কালাপানির ওপারের মার্কিন দেশের ব্যবসায়ী মহলে খুশির বন্যা সুনামিকেও হার মানিয়ে দেয়!

ভারতে উল্লাস

ভারতের যুদ্ধবাজ এবং মুৎসুদ্দি লবিটি খুশিতে আটখানা হয়ে এই সমঝোতার লাভ-ক্ষতির যে তালিকা পেশ করে তার দিকে নজর দেওয়া যাক। তাদের মতে—(১) নিউক্লিয়ার ক্ষেত্রে বাধার অপসারণ ঘটেছে— মার্কিন দেশের নিউক্লিয়ার চুল্লির সরবরাহকারীদের যে আশঙ্কা ছিল যে চুল্লির দুর্ঘটনা ঘটলেই (যা আজ বা কাল যে ঘটবেই, তা চুল্লির নির্মাতাদের চেয়ে বেশি ভালো কেউ জানে না) ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে বিশাল সংখ্যক মানুষকে ক্ষতিপূরণ দিতে দিতেই তাদের লাভের কড়ির গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটবে— এখন আর সেই আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। এখন ভারত সরকার নিজেই সেই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে— ভূপালের মতো ইউনিয়ন কার্বাইডকে ৭১৫ কোটি ঠেকিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে পালাতে হবে না।

(২) সামরিক উৎপাদনে যৌথ উদ্যোগ—যে কটি ক্ষেত্রে যৌথ (অর্থাৎ ভারত-মার্কিন যৌথ) উদ্যোগ নেওয়া হবে সেগুলি হল পরবর্তী প্রজন্মের মনুষ্য-চালকহীন, আকাশ থেকে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য 'রাবণ' নামক উড়ানযান, সুপার হারকিউলিস হেলিকপ্টার, চলমান বহুমুখী শক্তির উৎস এবং একই সঙ্গে রাসায়নিক, জৈব এবং সনাতনী সমরাস্ত্রের বিরুদ্ধে পদাতিক এবং অন্যান্য সৈনিকদের জন্য সুরক্ষামূলক পোশাক উৎপাদন। এর জন্য প্রযুক্তি দেবে মার্কিন দেশ, রসদ ও শ্রমশক্তি যোগাবে ভারত। অতিরিক্ত উৎপাদন মার্কিন দেশ রপ্তানি করবে— ভারত তার লভ্যাংশ পাবে না।

(৩) দক্ষিণ চীন সাগরে চীনা নৌবহরের আধিপত্য খর্ব করতে ভারতীয় নৌবহরকে মার্কিন দেশ বাড়তি সুরক্ষা দেবে। চীন 'বাড়াবাড়ি' করলে মার্কিন দেশ ভারতীয় নৌবহর ও ভারতীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে সরাসরি চীনের মোকাবিলা করতে পারবে— এর জন্য ভারতের অনুমতি নিতে তারা বাধ্য নয়, যদিও আন্তর্জাতিক স্তরে জবাবদিহির প্রাথমিক দায় ও দায়িত্ব থাকবে ভারতের।

(৪) দ্বি-পাক্ষিক লগ্নি সমঝোতা— ২০০৬ সালের সমঝোতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল 'সোস্যাল সিকিউরিটি এগ্রিমেন্ট'। ২০১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে লগ্নির পরিমাণ ছিল ১০০০ কোটি মার্কিন ডলার— ২০১৫-তে সেই লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫০০০ কোটি ডলার।

মার্কিন দেশের ওভারসীজ প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন ভারতের গ্রাম এবং গঞ্জ অঞ্চলের ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উৎপাদকদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র পণ্য উৎপাদনের জন্য ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেবে। এই পণ্যগুলিতে 'মেড-ইন-আমেরিকা' ছাপ মেরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানির জন্য মার্কিন দেশের এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাঙ্ক ভারত সরকারকে আরও ১০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেবে।

(৫) ভারতের শহরের আধুনিকীকরণ— বেশ কয়েক লক্ষ কোটি ডলার ব্যয় করে মার্কিন দেশ তার নিজের পছন্দের কয়েকটি ভারতীয় শহরকে আধুনিকীকরণ করবে— যেমন আজমীড়, বিশাখাপত্তনম এবং কলকাতা। আধার কার্ড সহ অন্যান্য স্মার্ট কার্ড মারফত বিক্ষোভকারী শ্রমিক, ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীদের চটজলদি চিহ্নিতকরণের মতো নানান প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে মার্কিন দেশ থেকে ৫০০০ কোটি অনুদান মিলবে।

ভারত সরকারের সাফাই

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের ওয়েবসাইটে ভারত সরকারের অবস্থান 'স্পষ্ট' করার জন্য একটি প্রশ্নোত্তর প্রকাশ করেছে। সেখানে ভারত সরকার নিজেই এই প্রশ্ন করেছে, ভারত কি তার নিউক্লিয়ার দায়বদ্ধতা আইন ২০১০ এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিধি ২০১১-র সংশোধন করছে? জবাবে বলা হয়েছে, ভারত সরকার এই দুটির কোনোটিও পরিবর্তন বা সংশোধন করছে না। তা হলে কী প্রক্রিয়ায় ভারত বিদেশি লগ্নিকারীদের আশ্বস্ত করবে যে বিষয়ে বলতে গিয়ে এই ওয়েবসাইটের বক্তব্য হলো— ভারত সরকার তার আইনের পরিবর্তন করবে না, কিন্তু সরবরাহকারীদের যে সম্ভাব্য আর্থিক দায়, ভারত সরকার

একটি নিজস্ব বিমা ব্যবস্থার মাধ্যমে তা নিরসন করবে। আর ভারতের এই দায়বদ্ধতা আইন যে আন্তর্জাতিক আইন, অর্থাৎ কনভেনশন অন সাপ্লিমেন্টারি কমপেনশেসন ফর নিউক্লিয়ার ড্যামেজ-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তাও ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। কীভাবে এই প্রস্তাবিত বিমা ব্যবস্থা চলবে তা বলতে গিয়ে সরকারি ভাষ্য হল খানিকটা এইরকম— ভারতের এই বিমা কোষ আসলে একটি ঝুঁকি বদল করার প্রক্রিয়া, যার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা হলো ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি। এই বিমা সংস্থা বিমা কোষ-এ ৭৫০ কোটি টাকা দেবে, বাকি ৭৫০ কোটি টাকা আসবে ভারতের অন্যান্য ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মারফৎ। নিউক্লিয়ার চুল্লিতে দুর্ঘটনা ঘটলে তার সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ এই ১৫০০ কোটি টাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এই কোষ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা পাবে যে বা যারা চুল্লি চালাচ্ছে এবং যে বা যারা চুল্লি সরবরাহ করছে, তারা। তারা ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের এই টাকা বিতরণ করবে। যদি দেখা যায় যে, আর্থিক দায় ১৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তবে বিদেশি সংস্থার হয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তার অর্থভাণ্ডার থেকে অতিরিক্ত ১১০০ কোটি টাকার যোগান দেবে। যদি পুরো আর্থিক দায় এই ২৬০০ কোটি টাকা (১৫০০ কোটি টাকা বিমা এবং ১১০০ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান) ছাড়িয়ে যায়, তখন ভারত সরকার বিদেশি সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক কনভেনশন মারফত বাড়তি অর্থ জোগাড়ের উদ্যোগ নেবে!

কার লাভ? কার ক্ষতি?

বিদেশিদের ব্যবসার দায়-দায়িত্ব কেন ভারতীয় করদাতা জনগণ নেবেন, কেন বিদেশিদের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসার জন্য দুর্ঘটনার দায় নেবে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত বিমা সংস্থা, তার কোনো সদুত্তর আরএসএস পরিচালিত মোদী সরকারের নেই। বিদেশিদের লাভ মানে ভারতের জনগণের ক্ষতি— এই সহজ অংকটি কখনও আরএসএস-এর মাথায় ঢোকেনি।

কেবল গুজরাটের উদাহরণই টানা যাক। গুজরাটের মিথি ভিরদিতে ওয়েস্টিংহাউস সংস্থা যে ৬টি নিউক্লিয়ার চুল্লি বসাচ্ছে, সেখান থেকে তারা চুল্লি বিক্রি বাবদ ভারত সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা (হ্যাঁ, লক্ষ কোটি, ছাপার ভুল নেই)। মার্কিন দেশে প্রতিটি নিউক্লিয়ার চুল্লির চালক-উৎপাদকদের সরকার ব্যতীত একটি তৃতীয় পক্ষ মারফত ৩৭৫০ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল্য বিমা করা বাধ্যতামূলক। আর ভারত সরকার স্পষ্ট বলেই দিয়েছে যে বর্তমানে ক্ষতিপূরণের যে পরিমাণ স্থির করে দিয়েছে, ভবিষ্যতে সেই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে না অর্থাৎ আইনের যৌক্তিক প্রসারণ ভারত সরকার মেনে নেবে না। এই বিষয়টি ভারতের আইন ব্যবস্থার মূল দর্শনের বিরোধী। যেমন ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনার মৃতদের জন্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ১৯৮৫ সালে ছিল ১ লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা। ২০১৪ সালে যাঁরা সেই ক্ষতিপূরণ পাবেন তাঁদের তো বর্তমান মূল্যের সমতুল্য পেতে হবে। ২০২০ সালে যখন চুল্লি চালু হওয়ার পর ২০২৫ সালে ফুকুসিমার মতো দুর্ঘটনা ঘটে (ঘটবেই, শুধু সময়ের অপেক্ষা!) তাহলে তখন ১৫০০ কোটি টাকার মূল্য হয়ত ১৫ কোটি টাকা হবে। ক্ষতিপূরণের নামে এমন রসিকতার অর্থ কী!

ভূপালের ক্ষেত্রে যেমন রাজীব গান্ধী সরকার বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ইউনিয়ন কার্বাইড-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদালতে (বিদেশি আদালত সহ) মামলা করার অধিকার অর্ডিন্যান্স করে কেড়ে নিয়েছিল এবং তার পর কার্বাইডের সঙ্গে আদালত-বহির্ভূত সমঝোতা করে গ্যাসপীড়িতদের বুকে ছুরি মেরেছিল, ঠিক সেই একই কায়দায় মোদী সরকার নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের বিভিন্ন আদালতে (বিদেশি আদালত সহ) চুল্লি সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার আইনী এবং সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে মোদীর স্বপ্নরাজ্য গুজরাতের জন্য কী অপেক্ষা করে আছে তার একটা চিত্র আঁকা যেতে পারে— বর্তমান অভিজ্ঞতার আলোকে। গুজরাটের মিথি ভিরদিতে মার্কিন ওয়েস্টিংহাউস সংস্থা যে এপি-১০০০ প্রজন্মের দুটি নিউক্লিয়ার চুল্লি সরবরাহ করছে, সেই ধরনের চুল্লি এই সংস্থাটি পৃথিবীর কোথাও কখনও এই ২০১৫-র এপ্রিল পর্যন্ত সরবরাহ করেনি— তাদের হিসেব মতো বাণিজ্যিক স্তরে চুল্লিটি তৈরি করতে এখনও দু-তিন বছর লাগার কথা। মার্কিন দেশের জর্জিয়া প্রদেশে 'জর্জিয়া পাওয়ার' নামক তাদের সহযোগী সংস্থার সঙ্গে ভোগটেল উৎপাদন সংস্থায় এই উৎপাদন করতে গিয়ে দুটি সংস্থাই পরস্পরের বিরুদ্ধে ১০০০ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ মামলা করেছে। দু'দলই বলছে যে অন্য সংস্থাটি তার সুরক্ষা সংক্রান্ত মান বজায় রাখেনি— ফলে দুর্ঘটনার দায় তারা নেবে না! এই ওয়েস্টিংহাউস সংস্থাই ভারতে চুল্লির বরাত পেয়েছে। প্রথম দফার টাকাও তারা পেয়ে গেছে এবং ভারত সরকারকে যাবতীয় ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা সামলে জমি অধিগ্রহণ করে, পুনর্বাসন দিয়ে, বিক্ষোভ দমন করে, সামরিক সুরক্ষা সহ অন্যান্য বিষয় নিশ্চিত করতে বলেছে তারা। ততদিনে তারা নাকি চুল্লির সুরক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় 'সমস্যা'-র সমাধান করে ফেলবে!

ব্রিটিশ শাসনের সময় যারা ব্রিটিশের পক্ষে ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিল, সেই আরএসএস-এর ঔরসজাত বিজেপি এখন ক্ষমতায়— অতএব দেশদ্রোহীদের আপাতত জয়জয়কার!

প্রবন্ধ

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সত্তর বছর ঃ ফিরে দেখা

অশোক চট্টোপাধ্যায়

একবিংশ শতাব্দীর একটা দশক অতিক্রান্তির উত্তরপর্বে দাঁড়িয়েও বিগত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকটিকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। ঐ দশকটি আমাদের দেশে উগ্র ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের নগ্ন প্রকাশের দশক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের নবগঠিত হিন্দুসভা পরবর্তী আট বছরের মাথায় ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারত হিন্দু মহাসভা নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই ঘটনার ঠিক দশ বছরের মাথায় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এখন আর জনসংঘ নেই, সেখানে হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি। সংঘ পরিবারের মূল নিয়ন্তা শক্তি হলো আরএসএস। সহযোগী হিসেবে শিবসেনা সহ অন্যেরা তো আছেই।

বিগত শতাব্দীর অন্তিম লগ্নে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ তার পঁচাত্তরতম জন্মবার্ষিকী পালন করেছে তার ফ্যাসিস্ট চরিত্রের উন্মোচন ঘটিয়েই। ওই গোটা দশক জুড়েই তারা তাদের সংঘশক্তির উদ্যোগে এবং প্ররোচনায় অজস্র দাঙ্গা সংঘটিত করেছে, খুন-লুণ্ঠনের বেনজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ওই দশকের গোড়ায় ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর তারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটিয়েছিলো অবলীলায়, এবং এই অপকর্মের জন্যে তারা রীতিমতো গর্ববোধ করেছে। এর সূত্রে তারা সারা দেশে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেশকে রক্তাক্ত করেছিল। বিরানব্বইয়ের ৬ ডিসেম্বর শুধুমাত্র সুরাটেই তিনশ মানুষ খুন হন, এর মধ্যে ৯৫ শতাংশ মানুষই সংখ্যালঘু। ওই একই দিনে মুম্বাইয়ে দু-দফা দাঙ্গায় নিহত হন প্রায় তিন হাজার মানুষ। এই দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বাড়িতে বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুঠ এবং ধর্ষণের নির্মম ঘটনাবলী। মুম্বাইয়ের দাঙ্গার মূল পরিচালক শিবসেনা প্রধান বাল থ্যাকারে বিচারপতি শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের রিপোর্টে অভিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কোন শাস্তি হয়নি। বরং মহারাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন কংগ্রেস ও রাষ্ট্রবাদী কংগ্রেসের যে জোট সরকার, তাকে বাল থ্যাকারে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, ক্ষমতা থাকলে তারা যেন তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেন। অথচ সরকার নীরবে সেই হুমকি হজম করেছিল। সেই নতুন জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার মাসখানেকের মধ্যে শিবসেনার তরফে দাঙ্গার ঘটনা ঘটানো হয়েছিল।[১] ১৯৮১ থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত সারাদেশে ৩২৩৩টি দাঙ্গার ঘটনা ঘটে, যার ফলে মারা যান ১৮২২ জন মুসলিম ও ৭৫৩ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ। অর্থাৎ মোট মৃতের সংখ্যা ২৫৭৫ জন।[২] শুধুমাত্র ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দেই সরকারি হিসেবে সারাদেশে ৬২৭টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঘটনা ঘটে, যার ফলে নিহত হন ২০৭ জন মানুষ।[৩]

বিরানব্বইয়ের ঘটনার সাতবছর পর একটি ইংরেজি দৈনিকে গৌতম নাভালকারের একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেই প্রতিবেদনে গৌতমবাবু লিখেছিলেন যে বিরানব্বইয়ের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনার সাত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, সিবিআই তদন্তের কোনও ফলপ্রসূতা লক্ষ্য করা যায়নি। তিনি লিখেছিলেন :

> It is worth recalling that the demolition on December 6, 1992 and its aftermath not only resulted in the killings of hundreds of people and destruction of property worth several thousands crores... several of those implicated are members of Union Cabinet today and one of them heads the Union Home Ministry, in charge of internal security.

গৌতমবাবু আরও জানিয়েছিলেন যে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে চল্লিশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়, ১৯৯৬-এর জানুয়ারিতে সেই সংখ্যা বেড়ে হয় ৪৯ জন। শেষ পর্যন্ত শুনানি শেষ হয় ১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু তারপর থেকে দেখা গিয়েছে :

> Framing of charges by a special Magistrate has been stalled through stay orders issued by the Allahabad High Court. Each time a date is fixed, a stay order is issued. Over the last 30 monthes, nearly 10 such orders have been issued.[৪]

স্বভাবতই এই প্রক্রিয়ায় দাঙ্গার সংগঠক ও অপকীর্তির নায়করা পার পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতাসীন। স্বাভাবিক কারণেই সংঘপরিবারের ফ্যাসিস্ট আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর অন্তিম সময়ে ভারতবর্ষ ফ্যাসিস্ট শক্তির শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় বহন করেছিল। তখন বিজেপির ছিল জোটনির্ভর সরকার, তাতেই তার ওই রমরমা। আর বর্তমানে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লিতে ক্ষমতায় আসীন। স্বভাবতই বিপদ আরও ঘনীভূত হয়েছে।

আরএসএস-এর তাত্ত্বিক গোলওয়ালকর হিটলারের মতাদর্শকে তাঁর প্রেরণা হিসেবে স্বীকার করে বলেছিলেন যে হিটলারের শিক্ষা "হিন্দুস্তানে আমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো শিক্ষা, এবং এ থেকে আমাদের লাভ হতে পারে।"[৫] ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২ অক্টোবর *অর্গানাইজার* পত্রিকায় আরএসএস-এর

তরফে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়: তাদের লড়াই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে। এই তিন শত্রু হলো— মুসলমান, খ্রিস্টান এবং কমিউনিস্টরা।[৬] মুসলিমবিরোধী দাঙ্গা সংঘটিত করার পাশাপাশি খ্রিস্টান-হত্যার বিষয়াবলী এই শত্রু চিহ্নিতকরণের পরিণতি। এছাড়া শত্রু হিসেবে কমিউনিস্টরা তো স্বাভাবিকভাবেই ছিল, আছে এবং থাকবে।

ফিরে দেখা

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১ মে হামবুর্গের রেডিও ঘোষণা করেছিল : অ্যাডলফ হিটলার নিহত হয়েছেন। ২ মে সোভিয়েতের লালফৌজ বার্লিন দখল করে। ফিল্ড মার্শাল কাইজেলরিং-এর নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে ইতালিতে সব শত্রুতার সরকারিভাবে অবসান ঘটে।[৭] শুধু তাই নয়, ৪ মে তারিখে—

> All German forces in Netherlands, Northwest Germany and Denmark surrendered to Field Marshal Montgomery's 21st Army Group, and General Paten's US seventh Army, having captured. Berchtesgaden, drove through the Brenner pass and joined up wih General Clark's Fifth Army.[৮]

বার্লিনের পতন ও হিটলারের নিহত হওয়ার খবর আমাদের দেশে এসে পৌঁছায় ৩ মে, ১৯৪৫ তারিখে। ৪ মে কলকাতার রাজপথে বেরোয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় মিছিল। ২৫০০০ মানুষের উদ্দীপিত এই মিছিলের সংবাদভাষ্যের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> ৪ মে শুক্রবারে বার্লিনের পতন উপলক্ষে উৎসব করার জন্য কলকাতার রাস্তায় পঁচিশ হাজার মানুষের মিছিল বেরিয়েছিল। মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটি। বস্তুত প্রায় প্রত্যেকটি শিল্পের শ্রমিকরা এই বিরাট মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন, সঙ্গে এনেছিলেন বিরাট বিরাট পোস্টার, যাতে দেখানো হয়েছিল লালফৌজের গৌরবমণ্ডিত অগ্রগতি ...দু'মাইল লম্বা মিছিলটি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় প্রচুর ভিড় হয়েছিল এবং বারান্দায় ও ছাদে প্রচুর মানুষ মিছিল দেখেছিলেন ...মিছিলের সর্বত্র সমান উদ্দীপনা ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, যার দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে বার্লিনের পতন শুধুমাত্র একটি সামরিক বিজয় নয়, মানব সমাজের স্বাধীনতালাভের ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন।[৯]

বাস্তবিক ফ্যাসিবাদের পরাজয় সারা বিশ্বজুড়ে এনেছিল স্বস্তির হাওয়া। কলকাতার এই উদ্দীপিত মিছিলও সেই স্বস্তির হাওয়াকেই অভিবাদন জানিয়েছিল।

জার্মান ফ্যাসিস্টরা স্ত্রীর সামনেই তাঁর স্বামীকে খুন করেছিল, মৃত পুত্রের চিতাভস্ম তাঁর মায়ের কাছেই পাঠিয়েছিল পার্সেল করে। নির্যাতনশালায় ফ্যাসিস্ট বিরোধীদের ওপর বিষাক্ত ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করেছিল তারা। তারপর তাদের হাত ভেঙে চোখ উপড়ে নিয়েছিল, সজীব দেহের ওপর 'ফ্যাসিস্ট স্বস্তিকা' চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল।[১০] নাৎসিরা ক্ষমতায় আসার পর শুধুমাত্র জার্মানিতেই যেসব ফ্যাসিবিরোধী শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী-কমিউনিস্টদের তারা খুন করেছিল তাঁর সংখ্যা ৪২০০, গ্রেপ্তার করেছিল ৩১৭৮০০ জন প্রতিবাদী মানুষকে।[১১] এ তথ্য, বলাই বাহুল্য, অসম্পূর্ণ। জর্জি দিমিত্রভ এই তথ্য পেশ করেছিলেন ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে। নাৎসি এসএস বাহিনী নৃশংসভাবে খুন করেছিল ১,৪০,০০,০০০ জন মানুষকে। এর মধ্যে য়ুরোপীয় ইহুদীর সংখ্যা ৬০,০০,০০০, রুশ ৫০,০০,০০০, পোল ২০,০০,০০০, জিপসি ৫,০০,০০০ এবং অন্যান্য জাতির ৫,০০,০০০ মানুষ।[১২] আউসভিৎস বন্দিশিবিরে চব্বিশ ঘণ্টায় কম করে ১০,০০০ বন্দীকে খুন করা হয়েছিল।[১৩]

এহেন ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সত্তর বছর পূর্তি এবছর। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৯ মে য়ুরোপে ফ্যাসিবাদের পরাজয় সম্পূর্ণ হয়েছিল। আগামী ৯ মে আমরা কীভাবে পালন করবো এই দিনটিকে? বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংঘপরিবারের যে দলটি দিল্লির মসনদে আসীন হয়ে ইতিমধ্যে সারাদেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদের সমূহ বিপদকে সামনে নিয়ে এসেছে, এবছরের ৯ মে ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতার ক্ষেত্রে তা নতুন মাত্রা পাবে, সন্দেহ নেই।

ফ্যাসিস্ট বর্বরতার স্বরূপ

প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্যাসিবাদ কী বলতে চায়, কী করতে চায়? সে চায় যুক্তিহীনতাকে প্রতিষ্ঠা করতে, যুদ্ধকে নির্বিকল্প হিসেবে হাজির করতে। সে চায় আপাত-স্তাবকতার মধ্যে দিয়ে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের ব্ল্যাকমেল করে একদিকে নিজের আখের গোছাতে এবং অন্যদের বিভ্রান্ত করে ফয়দা তুলতে। সে চায় তার জিঘাংসার পরিতৃপ্তি ঘটাতে, বিশ্বমানবতার সামনে নিজেকে মূর্তিমান ত্রাস হিসেবে হাজির করতে। সে চায় সারা বিশ্ব অবনত মস্তকে তাঁর পদপ্রান্তে নতজানু হোক, সে চায় সারা বিশ্বের প্রশ্নাতীত ভাগ্যবিধাতা হতে।

১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নেপল্‌সে এক বক্তৃতায় মুসোলিনি বলেছিলেন :

> We have created our myth. The myth is faith; it is passion. It is not necessary that it shall be a reality. It is a reality by the fact that it is a good, a hope, a faith, that is courage. Our myth is the nation, our myth is the greatness of the nation![১৪]

অন্যত্র তিনি আবার বলেছেন :

> Three cheers for the war! May I be permitted to raise this cry. Three cheers for Italy's war, noble and beautiful above all. Three cheers also for in general.[১৫]

মুসোলিনির কাছে 'শান্তি' শব্দটি বিবেচিত হতো একটি অবাস্তব শব্দ হিসেবে। শান্তি অর্থে তিনি যুদ্ধের সামরিক ছেদকেই বুঝতেন, যা কখনই তাঁর আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। নাৎসি ইভার্স-এর মতে, "The Philosophy of Swastika defends the instincts of the heart against the insolence of reason."[১৬]

হিটলার তো শিল্পীর অভিজ্ঞতাকে মানুষের কাছে প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাকেই অস্বীকার করেছিলেন। খোলা আকাশ ও ধানক্ষেতকে যথার্থ নীল ও সবুজ মনে হওয়াকে তিনি পাগলামি বলে মনে করতেন! আর এহেন 'পাগলদের' জন্যে জেলখানাকেই তিনি উপযুক্ত স্থান বলে বিবেচনা করেছিলেন! *আ হিস্টরি অব পলিটিক্যাল থিয়োরি*-র প্রণেতা অধ্যাপক জর্জ এচ স্যাবাইন খুব যথার্থভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে ফ্যাসিস্ট দর্শনের অন্তর্বস্তুতে রয়ে গিয়েছে অযুক্তি, যার পেছনে রয়ে গিয়েছে একটি অতিকথা (মিথ); আর 'সত্য' হচ্ছে নিছক ইচ্ছা ও বিশ্বাসনির্ভর।

ফ্যাসিবাদ চিন্তার একনায়কত্বকে মান্যতা দেওয়ার কথা বলে। মহাকবি গ্যেটে চিন্তার একনায়কত্বকে মেনে নেননি। তাই যাতে আগামি কয়েক দশকের মধ্যে গ্যেটের নাম পৃথিবী ভুলে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে তৎপর হয়েছিলেন নাৎসি পণ্ডিত রোজেনবার্গ। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ মে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের লনে উপস্থিত ৪০০০০ মানুষের সামনে ২৫০০০ বইয়ের বহ্ন্যুৎসব করেছিল এই ফ্যাসিস্টরা। এইসব বইয়ের মধ্যে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে সিগমুন্ড ফ্রয়েড ও এরিখ মারিয়া রেমার্কের বইও ছিল।[১৭]

স্পেনে ফ্যাসিস্টদের দস্যুতা ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে 'লিগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজম অ্যান্ড ওয়ার'-এর সভাপতি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথমেই একটি বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

> স্পেনে আজ বিশ্বসভ্যতা পদদলিত। স্পেনের জনগণের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছে। অর্থ ও জনবল দিয়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করছে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ। ...শিল্প সংস্কৃতির গৌরবকেন্দ্র মাদ্রিদ জ্বলছে। বিদ্রোহীদের বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে তার শিল্পের অমূল্য সম্পদ। ...লাখে লাখে এগিয়ে আসুন, গণতন্ত্রের সাহায্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির রক্ষায়।[১৮]

ফ্যাসিবাদ সংস্কৃতির ঘোষিত শত্রু। একথা সমসময়ে আমাদের বাংলার অনেক প্রথিতযশা লেখক— চিন্তাচেতনায় যাঁরা মার্কসবাদকে গ্রহণ করেনি— তাঁরাও অন্তর থেকে উপলব্ধি করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু এই ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে বলেছিলেন :

> বর্বরতার বিরুদ্ধাচরণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নইলে আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না।... আমরা যারা সংস্কৃতিতে, বিশ্বমানবের ঐতিহাসিক প্রগতিতে আস্থাবান, আমাদের এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই হবে।[১৯]

প্রখ্যাত কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন :

> এই ফ্যাসিজমের অধীনে সে সাহিত্য যে শিল্প রচিত হবে তার কথা চিন্তা করতে গেলে আমার মনে পড়ে জেলখানার সতরঞ্চির কথা, ছোবড়া পাকানো দড়ির কথা; যার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাকে পাকে নির্যাতিত মানবাত্মার অভিশাপ।[২০]

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝির পর রবীন্দ্রনাথ আবার ফ্যাসিবাদবিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন। একসময় ধূর্ত মুসোলিনির কুশলী ফাঁদে তিনি পা দিয়েছিলেন এবং মুসোলিনির কিছু প্রশংসাও করেছিলেন। পরে রমাঁ রলাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তিনি ফ্যাসিজমের প্রতি মোহমুক্ত হন এবং শেষপর্যন্ত বিবৃতি দেন :

> যে মুহূর্তে আমি জেনেছি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রতি অন্ধ আসক্তিই ফ্যাসিবাদের লক্ষ্যস্থল সেই মুহূর্তেই তার প্রতি আমার সমস্ত সহানুভূতি আমি প্রত্যাহার করে নিয়েছি।[২১]

এই বিবৃতিটি রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে। আর এর ১৪ বছর পরে তিনি আবার বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন :

> জর্মানীর বর্তমান শাসকের উদ্ধত দুর্বৃত্ততার সর্বশেষ প্রকাশে বিশ্বের বিবেক প্রচণ্ড ঘা খেয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে দুর্বলের ওপরে পর্যায়ক্রমিক ভীতিপ্রদর্শন— রাইখরাষ্ট্রে ইহুদি নির্যাতন থেকে শুরু করে বীর ও প্রকৃত অর্থেই উদার চেকোস্লোভাকিয়ার বিনাশ পর্যন্ত— তারি অনিবার্য পরিণতি এই ঘটনা।[২২]

ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান : প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষ-১

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর সত্তর বছর অতিক্রান্ত হতে চললো। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কি ফ্যাসিবাদের পরাজয় ঘটেছে? ফ্যাসিবাদ কি মৃত? চেতনার অধিক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদ বেঁচে রয়েছে বহাল তবিয়তে। সে লালিত হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনাবলীর, মানবতাবিরোধী চিন্তাবিন্যাসের ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে রয়েছে এই অশুভ প্রবণতা, সে জমি খুঁজছে, সংগ্রহ করছে গরল— যা ঠিক সময়ে ঠিকভাবে উগরে দিয়ে বিষেয় ধোঁয়ায় আগুন জ্বালাবে।

৬ ডিসেম্বর '৯২-র কথা, দেশব্যাপী করাল অগ্নিশিখার সামনে বিপন্ন মানবতার সেই দুঃস্বপ্নের মুহূর্তগুলি, তার ক্ষতগুলি এখনও জ্বলজ্বল করছে দীর্ঘ বাইশ বছর অতিক্রান্তির পরেও। আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন কৌশলে মানবতাবিরোধী এই ফ্যাসিস্ট প্রবণতাগুলি ক্রমাগত রসদ সংগ্রহ করছে। সত্তর বছর পরেও ফ্যাসিবাদের বিপদ শুধু

যে রয়ে গিয়েছে তা নয়, তা এখন ক্রমশই উন্মত্ত হয়ে উঠছে— এই আমাদের দেশেই। মনে রাখতে হবে, অযুক্তিই ফ্যাসিবাদের যুক্তির আহরণক্ষেত্র। অবিজ্ঞানই তার কাছে বিজ্ঞান বিরোধিতার জন্যে গ্রহণীয়। যুক্তির বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে, মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে— সংগঠিত ও সর্বাত্মক যুদ্ধই হলো ফ্যাসিবাদ।

আমাদের দেশে বিজেপি, ভিএচপি, শিবসেনা, আরএসএস সহ নানাবিধ নানাধরনের সংগঠন আছে সংঘপরিবারের। এই সংঘপরিবারের সমস্ত শাখা প্রশাখাগুলি ফ্যাসিস্ট মননে ঋদ্ধ ফ্যাসিবাদী প্রক্রিয়ায় লালিত ও বিকশিত। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর এরা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে সেভাবে ধ্বংস করে উল্লাস প্রকাশ করেছিল, তাতে করে তাদের উগ্র ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী চরিত্রই নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। এমন উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি তরুণদের মধ্যে তারা প্রোথিত করেছে যে অযুক্তি ও অসম্প্রদায়গত সুতীব্র বিদ্বেষ তাদের মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। বিরানব্বুইয়ের ৬ ডিসেম্বরের প্রায় আড়াই বছর পর একজন সাংবাদিক ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে অযোধ্যায় গিয়ে এরকম তথ্যেরই সন্ধান পেয়েছিলেন। ষোলোবছর বয়স্ক দশমশ্রেণীর ছাত্র জনৈক সন্তোষ, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রসঙ্গে রীতিমতো ক্রোধের সঙ্গেই সে বলেছিল : প্রতিটি মুসলমানই বিশ্বাসঘাতক, তাদের এদেশ থেকে খেদিয়ে দেওয়া উচিত, তাদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে তাদের সব সম্পত্তি লুট করে নেওয়া উচিত![২৩] বিষযটির তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য।

পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট প্রক্রিয়ার অনুশীলনেই এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি ক্রমাগত রসদ সংগ্রহ করে চলেছে। নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হওয়ার ব্যাপারেও এরা সর্বাত্মকবাবে সামিল হয়েছিল এবং বৃহৎ পুঁজি ও কর্পোরেট দৈত্যদের হিসেব ও হিসেব-বর্হিভূত সাহায্য-সহযোগিতায় পরিপুষ্ট হয়েছিলো। নির্বাচনের সময় সংঘপরিবার সারা দেশ জুড়ে যেভাবে একটা উন্মাদনা শুরু করেছিল একক-নায়কের প্রচারে, তা একদিকে যেমন অতীতের সব রেকর্ড ম্লান করে দিয়েছিল, তেমনই অভূতপূর্ব সাফল্যও অর্জন করেছিল। 'অচ্ছে দিন' নামক এক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক স্বপ্ন বিক্রি করে সংঘপরিবারের বিশ্বস্ত সেনাপতি নরেন্দ্র মোদি তো স্বপ্নের সওদাগর-ই হয়ে গেলেন। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরের নির্বাচনে যে মুসোলিনির পার্টি (Fascist Di Combatti Mento) মিলানে ১,৮০,০০০ সমাজতান্ত্রিক ভোটের বিপরীতে মাত্র ৪৭৯৫টি ভোট পেয়েছিল, সেই পার্টিই পরবর্তীতে দেশের শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েছিল।[২৪] ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে যে ফ্যাসিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল ২০,০০০, তা পরের বছর বেড়ে দাঁড়ায় ২,৪৮,০০০-এ।[২৫] ১৯২১-এর নভেম্বরে ফ্যাসিস্ট ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা যেখানে ছিল ৬৪,০০০, পরবর্তী দুমাসের মাথায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ২,০০,০০০ এবং ১৯২২-এর শেষে তা আরও বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮,০০,০০০-এ।[২৬] আর এভাবেই মুসোলিনির রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পথ সুগম হয়েছিল। ইতালিতে ফ্যাসিস্ট পার্টি যে প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় এসেছিল, তার সাথে সংঘ পরিবার ও বিজেপি-র ক্ষমতায় আসার প্রক্রিয়ার মিল দুনিরীক্ষ্য নয়। যে হতাশা, অর্থনৈতিক নৈরাশ্য, জাতীয় রাজনীতির সংকট ফ্যাসিস্ট শক্তির মাথা তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল, সে ধরনের অবস্থা আমাদের দেশেও বিদ্যমান। সোভিয়েতের পতনের ফলশ্রুতিতে বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যে সংগঠিত আক্রমণ শুরু হয়েছিল, তাও আমাদের দেশের এই হিন্দুত্ববাদী ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির হাতে আরও কার্যকর অস্ত্র তুলে দিয়েছে। আমাদের দেশে বিজেপি সহ সংঘ পারিবারের দলসমূহ এবং তাদের সমস্ত শাখা সংগঠনগুলি মার্কসবাদ ও কমিউনিজমকে তাদের চরমতম শত্রু বলে মনে করে। বিজেপি-র ছাত্র সংগঠনের (অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ) তরফে প্রকাশিত একটি পুস্তিকা প্রথমেই নির্দিষ্টভাবে নকশালপন্থী ও সিপিআই(এমএল) এবং সাধারণভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে।[২৭] স্বভাবতই এদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার।

মহারাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার আগে শিবসৈনিকরা *মহানগর* পত্রিকার অফিস ভেঙে দিয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর বাল থ্যাকারের নেতৃত্বে সেখানে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। শিবসেনার রক্তচক্ষুর সামনে বহু খবরের কাগজ মাথা নত করেছিল। এক মহিলা সাংবাদিককে তাঁর ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে গিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল! এর ফলে সেই সাংবাদিক ভদ্রমহিলা এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি থানায় ডায়েরি করার সাহস পর্যন্ত পাননি। পাশাপাশি একথাও মনে রাখা দরকার যে, যে কোনও থানায় এই ডায়েরি নেওয়া হতো না, কারণ ''সত্তর ভাগ বোম্বে পুলিশই তো সেনা সমর্থক। দাঙ্গার সময় এরা প্রকাশ্যে মুসলিম পেটানোয় মদত'' দিত।[২৮] নির্ভীক সাংবাদিক নিখিল ওয়াগলে শিবসেনাধ্যক্ষ বাল থ্যাকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাঁর রক্তচক্ষুর দিকে প্রতিস্পর্ধায় মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

উনিশশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে সম্পূর্ণ রাস্তা জুড়ে গণেশপুজোর প্যান্ডেল করার বিরুদ্ধে প্রশাসনের তরফে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারির প্রতিবাদে সেখানে রাতারাতি গণেশসেনা গঠন করা হয় এবং সেই গণেশসৈনিকরা প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার সমর্থক জনৈক আইনজীবীর ওপর চড়াও হয়েছিল।[২৯] স্মরণ থাকতে পারে যে গণেশের দুধ খাওয়ার মতো একটি তথাকথিত বহুলপ্রচারিত অথচ স্বল্পস্থায়ী ঘটনাকেও এই হিন্দুত্ববাদীরা বিজ্ঞানবিরোধী অবিজ্ঞানের আবেগময় যুদ্ধে সঞ্চালিত

করেছিল। এখানেও যুক্তির বিরুদ্ধে তাদের হাতিয়ার ছিল অযুক্তিই। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে হিন্দুধর্মীয় ভাবাবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে বলা হয়েছিল :

> ...the phenomenon being called the milk miracle should be taken as a precursor of things to come and an indicator that the coming century would be a Hindu one.[৩০]

ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান : প্রেক্ষাপট ভারতবর্ষ-২

আগামি শতাব্দী অর্থাৎ এই একবিংশ শতাব্দীকে 'হিন্দু ভারত' তথা ফ্যাসিস্ট ভারত বানাবার সংঘ-পারিবারিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নের সন্ধান করছে সংঘ, বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়ায়। আর এই স্বপ্নের হিন্দু তথা ফ্যাসিস্ট ভারতে কমিউনিস্টদের কোনও স্থান থাকবে না, মুসলমানদের কোনও স্থান থাকবে না, খ্রিস্টান সহ অহিন্দু জনসাধারণের কোনও স্থান থাকবে না। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ আগস্ট তৎকালীন বিজেপি-সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানি বিবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নির্দ্বিধায় বলেছিলেন : "ভারতীয় জনতা পার্টিকে হিন্দু রাজনৈতিক দল হিসেবে উল্লেখ করা ভুল নয়।" ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের ৭ নভেম্বর সংঘপরিবারের অবিসংবাদিত নেতা বালাসাহেব দেওরস খুব নির্দিষ্টভাবে হিন্দু এবং জাতীয়তা শব্দ দুটিকে সমার্থক বলে ঘোষণা করেছিলেন। গোলওয়ালকরও ভারতীয় এবং হিন্দু শব্দদ্বয়কে সমার্থক বলে গণ্য করেছিলেন। তাঁর *বাঞ্চ অব থটস* গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন : 'ভারতীয়' শব্দটিকে সাধারণত 'ইন্ডিয়ান' নামক ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে দেখা হয়। সাধারণত ইন্ডিয়ান বললে এদেশে বসবাসকারী মুসলিম, খ্রিস্টান, পার্সি প্রমুখ সবাইকে বোঝায়। ফলে তা বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। বরং হিন্দু শব্দটি হচ্ছে ঠিক সেই নির্ভুল শব্দ যা 'আমরা' বোঝাতে চাই।[৩১]

গোলওয়ালকার বলেছিলেন যে "আমরা ;নারীকে পবিত্র মাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে গৌরবান্বিত করলে (একজন মুসলিম) চাইবে নারীর শ্লীলতাহানি করতে।"[৩২] অর্থাৎ মুসলমানরা কাজই হলো হিন্দু নারীর শ্লীলতাহানি করা! আর সেই জন্যেই শ্লীলতাহানির হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করতেই হিন্দুত্ববাদীরা নারীকে মাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে গণ্য করতে চান না! মার্চ ১৬, ১৯৪৪ তারিখে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্র দপ্তর তার এক সার্কুলারে বলেছিলো যে "আরএসএস হলো একটা রাজনৈতিক-বাণিজ্যিক সংগঠন যা ফ্যাসিবাদী ধারায় একটা জঙ্গি সংস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।"[৩৩] এই কথাটি যে কতখানি সত্য তা এর একাত্তর বছর পরেও আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে গোলওয়ালকরের *উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড* প্রকাশিত হওয়ার বছর দুয়েক পর গঠিত হয় জামাত-এ-ইসলামি। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে মওলানা আবুল আলা মওদুদির নেতৃত্বে তার প্রতিষ্ঠা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পাঠানকোটে। আরএসএস-এর গোলওয়ালকর-এর প্রতিবর্ত ছিলেন জামাত-এ-ইসলামির মওদুদি। দুই ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনের এই দুই নেতার রাজনৈতিক অবস্থানে অমিলের পাশাপাশি মিল-ও অনেক। হিটলার একইসঙ্গে গোলওয়ালকর ও মওদুদির গুরুস্থানীয়। সাতচল্লিশে দেশভাগের প্রেক্ষিতে মওদুদি এক বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে যা বলেছিলেন তা বিস্ময়কর হলেও সত্য। তিনি অকপটে বলেছিলেন :

> যদি হিন্দুবিধানের ওপর ভর করে কোনো হিন্দু সরকার ভারতে আসে এবং মনুর বিধান আইনরূপে গৃহীত হয়, এবং যার ফলে মুসলিমরা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হয়, সরকারে তাদের অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া হয়— শুধু তাই নয়, তারা (যদি) নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত পর্যন্ত হয়, তবে আমার আপত্তি নেই। (অনুবাদে এমনই আছে— অ চ)[৩৪]

১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে গোলওয়ালকর তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে যেভাবে কমিউনিজমের মতো একটা বিদেশি মতবাদ ক্রমাগত বেড়ে উঠছে, তাতে তাঁর উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছে। তিনি প্যাটেলকে সরাসরি প্রস্তাব দেন, যদি সরকারি ক্ষমতা আর তাঁদের সংগঠিত ক্ষমতা জোটবদ্ধ করা সম্ভব হয়, তাহলে এদেশ থেকে কমিউনিজমের বিপদ দূর করা সম্ভব।[৩৫] সংঘপারিবারিক হিন্দুত্ববাদীদের কমিউনিস্টবিরোধী অ্যাজেন্ডা এখানে পরিষ্কার। ফ্যাসিস্ট দর্শনের এই বিষয়টিকে তারা আন্তরিকভাবেই আত্মস্থ করেছিল। নাৎসি জার্মানির গোয়েরিং বলেছিলেন, কেউ যখন সংস্কৃতি আর ইতিহাসের কথা বলে তখন তাঁর হাত কখন যেন নিজের অজান্তেই রিভলভারের ট্রিগারের দিকে চলে যায়![৩৫ক] আমাদের দেশের পশ্চিমবঙ্গে একটি দৈনিক বাংলা সংবাদপত্রে বিখ্যাত লেখক গৌতম রায় ধারাবাহিকভাবে আরএসএস-এর তথ্যমূলক ইতিহাস লিখছিলেন, এবং যেহেতু সেই লেখায় আরএসএস-এর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হচ্ছিল, সেহেতু গৌতম রায়কে রীতিমতো হুমকির মুখোমুখি হতে হয়েছিল, তাঁর মোটর বাইকটিকে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।[৩৬] এ ঘটনা ২০০২ খ্রিস্টাব্দের। তখন এনডিএ-নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার দিল্লির ক্ষমতায় আসীন। সংখ্যালঘু সরকার, অন্যের সহযোগিতা-নির্ভর। আর এখন তো বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লীর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। স্বভাবতই তাদের আগ্রাসী হিন্দুত্ব ফ্যাসিবাদের প্রকাশ ঘটাই স্বাভাবিক।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম দিকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিলো 'ইসলামি মৌলবাদ' প্রসঙ্গে দুদিন ব্যাপী এক সেমিনার। এই সেমিনারের উদ্যোক্তা ছিলো আরএসএস স্বয়ং। এই সেমিনারের পরবর্তীতে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে

আরএসএস-এর তৎকালীন সরসংঘচালক মোহন ভাগবত বলেছিলেন : "২০১৪ খ্রিস্টাব্দে যদি বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারে, তবে আগামি পঁচিশ বছর আর তাদের ক্ষমতা থেকে সরানো সম্ভব হবে না। আর যদি বিজেপি তা না পারে, তবে আগামি একশ বছরের মধ্যে তারা আর তা পারবে না।"[৩৭] এই বক্তব্যের মধ্যে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আরএসএস যে কতটা মরিয়া হয়ে উঠছিলো, তা পরিষ্কার। বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ায় সংঘপরিবারের ১৫০০০০ প্রকল্প কার্যকরী রয়েছে, তারা এখন 'অচ্ছে দিনের' প্রসাদ ভোগ করতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। ভাগবত নির্দিষ্ট করেই বলেছেন যে এদেশের হিন্দুরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার আশংকার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন সুতরাং এখন এদেশের হিন্দুদের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদী অবস্থান নেওয়া দরকার।[৩৮] ইঙ্গিতটি পরিষ্কার। অথচ বাস্তব তথ্য হলো, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা যেখানে ছিলো মোট জনসংখ্যার ১৩.৪০ শতাংশ, তা ২০১১ খ্রিস্টাব্দে দাঁড়িয়েছে ১৪.২০ শতাংশ। অর্থাৎ এই দশবছরে এই হার বৃদ্ধি হয়েছে ০.৮০ শতাংশ মাত্র। স্বভাবতই সংঘপারিবারিক নেতৃত্ব কেন এবং কী উদ্দেশ্যে আসল তথ্য চেপে গিয়ে ভুল এবং মিথ্যে তথ্য পরিবেশন করে হিন্দুদের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের পক্ষে সওয়াল করছেন, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ডোনাল্ড স্মিথ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *ইন্ডিয়া অ্যাজ আ সেকিউলার স্টেট* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছিলেন ঃ

> The leader principle, the stress on militarism, the doctrine of racial-cultural superiority, ultra-nationalism infused with religious idealism, the use of symbols of past greatness, the emphasis on national solidarity, the exclusiuon of religious or ethnic minorities from the nation concept— all these features of the RSS are highly reminiscent of fascist movement in Europe.[৪০]

আরএসএস-এর যে যে বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করে তার মধ্যে য়ুরোপের ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের প্রতিরূপের সন্ধান পেয়েছেন ডোনাল্ড স্মিথ, তাতে যে অতিশয়োক্তি কিছু নেই, তা বোধকরি বিতর্কাতীত। সত্তরের দশকে ভিওয়ান্ডি দাঙ্গার প্রেক্ষিতে ম্যাডন কমিশন তার রিপোর্টে বলেছিল যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রাতারাতি ছড়ায় না; সাম্প্রদায়িক প্রচার, সাম্প্রদায়িক ঘটনায় ক্রমাগত ইন্ধন, পরিকল্পিত গুজব ছড়ানো প্রভৃতি কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় মানুষের মনের ভেতর ঘৃণা জাগানো ও হিংস্র আচরণের বীজ বপন করার মধ্যে দিয়ে এর প্রকাশ ও বিস্তার ঘটে।[৪১] এবং ঠিক এই কাজগুলিই সংঘপরিবার রীতিমতো পরিকল্পনামাফিক আমাদের দেশে করে থাকে। বিরানব্বইয়ে বাবরি ধ্বংসের ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো ন্যক্কারজনক ঘটনাবলীই এর প্রমাণ। তেলিচেরির দাঙ্গা প্রসঙ্গে তদন্ত কমিশনের তরফে তো সরাসরি সংঘপরিবারের দিকে আঙুল তোলা হয়েছিল, তদন্ত কমিশনের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি কোনোরকম দ্বিধা ব্যতিরেকেই বলেছিলেন যে তেলিচেরির দাঙ্গার পেছনে যে জনসংঘের হাত ছিল, এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ, এমনকি এই দাঙ্গা সংঘটিত করার পেছনে যে আরএসএস তেলিচেরির হিন্দুদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়েছিল, সে ব্যাপারেও তিনি সুনিশ্চিত।[৪২]

এনডিএ-র আমলে (১৯৯৯-২০০৪) সংঘপরিবারের কট্টর সদস্য কৃষ্ণ গোপাল রাস্তোগি তৎকালীন কেন্দ্র সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের দুটি কমিটির কাজের দায়িত্বে বহাল ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'প্রচারক জীবন'-এ গর্বের সঙ্গে লিখেছেন যে একটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ২৫০ জনের মতো কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি হামলা চালান, হত্যালীলা সংঘটিত করেন, লুটতরাজ করেন এবং একটি অসাধারণ সুন্দরী অসহায় বাচ্চা মেয়েকে নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করেন। এবং তাঁর গর্বোদ্ধত উক্তি সম্বলিত এই আত্মজীবনী গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেছিলেন আরএসএস-এর তৎকালীন প্রধান সুদর্শন স্বয়ং![৪৩] অসীমানন্দের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার পেছন যে আরএসএস-এর উচ্চ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছিল, তা এক সাক্ষাৎকারে অসীমানন্দ নিজেই স্বীকার করেছেন। তিনি একথাও বলেছেন, মোহন ভাগবত তাঁকে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে রীতিমতো উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "এ ধরনের কাজ করতেই হবে, তবে দেখো এ ব্যাপারে যেন সংঘপরিবারের নাম জড়িয়ে না যায়"।[৪৪] এই হচ্ছে সংঘপরিবারের স্বরূপ। এই স্বরূপকে আড়াল করে তারা অনেক জনমোহিনী কথাবার্তা বলে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তরুণসমাজকে উদ্দীপিত করে এবং যথাসময়ে নিজেদের অ্যাজেন্ডার অনুশীলন করে। জার্মান ফ্যাসিবাদের অনুসরণে সংঘপরিবার দেশের তরুণ সম্প্রদায়কেই বেশি বেশি করে তাদের কাজে লাগাতে চায়। বিশেষত মুসলিম এবং খ্রিস্টানবিরোধী প্রচার এবং ধ্বংসাত্মক প্রচারণা তরুণসমাজকে সহজেই আকৃষ্ট করে। মনে রাখা দরকার নাৎসি জার্মানিতে হিটলার চ্যান্সেলর হওয়ার মাত্র সাড়ে চার মাস পর ১৯৩৩ সালের মে মাসে বার্লিনে যা ঘটেছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে আগে কখনও ঘটেনি। মধ্যরাত্রে হাজার হাজার ছাত্র মশাল মিছিল করে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এসে জড়ো হয়। সেখানে অজস্র বই স্তূপীকৃত করা ছিল। ছাত্ররা সেই বইয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়। বই পোড়াতে পোড়াতে আগুন যখন তার লেলিহান শিখা বিস্তার করতে থাকে, তখন সেই আগুনে আরও অসংখ্য বই ছুঁড়ে দেওয়া হয়। সেদিন সেখানে কম করে ২০০০০ বই ভস্মীভূত হয়েছিল। এভাবে জার্মানির অন্যান্য শহরেও বই পোড়ানো হয়। আর এভাবেই নাৎসি জার্মানিতে

বইয়ের বহ্ন্যুৎসবের সূত্রপাত হয়েছিল। বই যখন পুড়ছিল তখন সেইসব ছাত্ররা হর্ষধ্বনি করছিল। স্বয়ং গোয়েবলস এই ঘটনার তারিফ করছিলেন।[৪৫] ২০১৪-র নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার সরকারি-বেসরকারি সমস্ত ক্ষেত্রেই সংঘ-পরিবারের নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে উঠে পড়ে লেগেছে। বিভিন্ন সংস্থা থেকে বিখ্যাত বামপন্থী ব্যক্তিত্বদের সরিয়ে সংঘের মতাদর্শের অনুসারী ব্যক্তিদের বসিয়ে নিজেদের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করার প্রয়াসের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন। জার্মানিতেও একই রকম অনুশীলন হয়েছিল। সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৩৩ তারিখে জার্মান রাইখের সাংস্কৃতিক দপ্তরে গোয়েবলস-এর নির্দেশক্রমে এক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী :

> In order to pursue a policy of German culture, it is necessary to gather together the creative artists in all sphere into united organization under the leadership of the Reich. The Reich must not only determine the lines of progress, mental and spiritual, but also lead and organise the professions.[৪৬]

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জুলাই হিটলার স্বয়ং জানিয়েছিলেন যে জার্মানিতে 'সাংস্কৃতিক পাগলামি'র অবসান ঘটতে চলেছে এবং জার্মান জনসাধারণের মন-মনস্কতাকে দূষিত করার সাংস্কৃতিক অপপ্রয়াসের পথ রুদ্ধ করা হল।[৪৬] অনুরূপ ঘটনাই যে এদেশে সংঘপরিবার ঘটাতে উৎসাহী, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। ইতিমধ্যে সারাদেশে দাঙ্গার ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘর ওয়াপ্‌সি-র নামে ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়ায় গরিব মানুষজনকে প্ররোচিত করা চলছে। খোদ দিল্লি সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চার্চের ওপর হামলা চলছে, স্কুলে সংঘ-মতাদর্শের অনুগামী হওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। স্কুলে গীতা পড়ানো আবশ্যিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের উপস্থিতি একমাত্র হিন্দু মন্দির ছাড়া আর কোথাও নেই বলে প্রচার করা হচ্ছে। গান্ধীহত্যার কুখ্যাত খুনি নাথুরামকে বীরের সম্মান দিয়ে তাকে দেবতা বানিয়ে মন্দিরস্থ করার অপপ্রয়াসও চলেছে। গোহত্যা নিষিদ্ধ করে কট্টর হিন্দুত্ববাদী অনুশীলনকে জাতীয়স্তরে চারিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিসদৃশ পদলেহন করে সাধারণ জনস্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করে চলেছেন নরেন্দ্র মোদি সরকার।

ফ্যাসিস্ত প্রবণতার ক্রমোত্থান ; প্রেক্ষাপট পশ্চিমবঙ্গ

বিজেপি সহ সংঘপরিবারের অন্যান্য সংগঠনগুলিও পশ্চিমবঙ্গে ডালপালা বিস্তারের অবিরাম প্রয়াস চালাচ্ছে। কেন্দ্রে বিজেপি নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গেও তারা তাদের কার্যক্রমের ফলিত অনুশীলনে রীতিমতো উদ্যোগী হয়েছে। এখানে সরকারি বামপন্থার অস্তিত্বের সংকট, কংগ্রেসের অবসৃয়মানতা এবং ক্ষমতাসীন তৃণমূল সরকারের জনবিরোধী চরিত্র ও স্বৈরাচারী ভূমিকায় বিরক্ত মানুষের সামনে তারা নতুন আশার আলোর দিশা দেখাতে গিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধিতা এবং সরকারের মুসলিম তোষণ, অনুপ্রবেশ ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে গরু পাচারের মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলিকে সামনে এনে জনমনে। বিশেষ করে তরুণদের মনে প্রভাব ফেলে নির্বাচনে রাজনৈতিক ফয়দা তোলার আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সারদা কেলেঙ্কারির মতো বিষয়ও। যদিও এসব সত্ত্বেও তারা এখনও পর্যন্ত তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জনে সমর্থ হয়নি দুটি এমপি ও একটি এমএলএ-র আসন জেতা ছাড়া। তবে তারা চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখছে না। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা বলতেই হবে। নির্বাচনে তাদের প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ বেড়েছে, সন্দেহ নেই।

বিজেপি তথা সংঘপরিবারের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের সংগঠনগুলি আমাদের দেশে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের উত্থানের বিপদকে ক্রমশই স্পষ্ট করে তুলেছে। জাতীয় রাজনীতিতে তাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের স্বপ্নের হিন্দু ভারত গঠন করার প্রক্রিয়ায় হিন্দুত্ববাদীরা এখন অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। পশ্চিমবঙ্গে শাসকদলের চরম স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ, সরকারের জনবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে আন্দোলনরত মানুষের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিহীনতা, এমনকি প্রতিবাদকে সরকারের বিরুদ্ধে সিপিএম ও মাওবাদীদের চক্রান্ত হিসেবে নির্বিশেষ আখ্যাদান, ন্যূনতম সহনশীলতার অভাব জনমানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অপরিমেয় ক্ষোভ-বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। বিজেপি তথা সংঘপরিবারিক শক্তিগুলি এসবের সুযোগ নিয়ে ক্ষুব্ধ মানুষের বন্ধু সেজে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করে চলেছে। সরকারবিরোধী শক্তিগুলির দুর্বলতা তাদের আরও উৎসাহিত করেছে। সস্তা বুকনি আর চমক এবং এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের একটা মোহগন্ধী চাটনি দিয়ে এরা মানুষকে আকৃষ্ট করছে। মানুষ যে একেবারে আকৃষ্ট হচ্ছেনা, এমন তো নয়। পশ্চিবঙ্গে দীর্ঘ বামপন্থী শাসনেই বিজেপি সহ হিন্দুত্ববাদীদের পা রাখার জায়গা তৈরি হয়েছিল। এটা অস্বীকার করা যাবেনা। বিরানুনব্বইয়ে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তো আর ভোলবার নয়। দীর্ঘ বামজমানায় কীভাবে বিজেপি সহ হিন্দুত্ববাদীরা পশ্চিমবঙ্গে পা রাখার জায়গা তৈরি করে? কীভাবে তারা বিকাশলাভ করে? কে বা কারা তাদের রসদ যুগিয়েছিল? এসব প্রশ্ন তো আর এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের কাছে মার্কসবাদ এবং কমিউনিজম ঘোরতর শত্রু বলে চিহ্নিত। তৃণমূলের জনবিরোধী ভূমিকা ছাড়াও এই প্রপঞ্চটি ধরেও তারা এখানে এগোতে চাইছে। মনে রাখতে হবে

যে খোদ বাম আমলেই বিজেপির ছাত্র সংগঠন কলকাতার বুক থেকে লেনিনের মূর্তি অপসারণের দাবি তুলেছিল। এই দাবি ছিল প্রকৃত অর্থে মার্কসবাদ তথা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণার সামিল। এই দাবির যৌক্তিকতা হাজির করতে গিয়ে ওই ছাত্র সংগঠনের তরফে প্রকাশিত এক পুস্তিকায়[৪৮] দেখাবার চেষ্টা হয়েছিল লেনিন কতো নিষ্ঠুর, অমানবিক এবং হৃদয়হীন ছিলেন! মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমবঙ্গে আশির দশকেই আরএসএস বেশ কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করেছিল। ১৯৮৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে আরএসএস-এর উপশাখা ছিল প্রায় ১০০০, যা ১৯৮৯-৯০-এ বেড়ে দাঁড়ায় ২৫০০-র মতো। ১৯৯২-তে এই উপশাখার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৪২৩৮টি এবং শাখার সংখ্যা ৪১৫১টি। অর্থাৎ শাখা-উপশাখা মিলে মোট ৮৩৮৯। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে আরএসএস-এর পূর্ণ স্বয়ংসেবকের সংখ্যা ছিলো ৩১৪২৩ জন। সাধারণ স্বয়ংসেবকের সংখ্যা ছিল ১৩০৮৫৮ জন এবং সমর্থক স্বয়ংসেবকের সংখ্যা ছিল ১৩৭২০৫ জন।[৪৯] এরপর কুড়ি বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের শক্তি বৃদ্ধি হয়েছে। বর্তমানে অনুকূল পরিস্থিতিতে তারা আরও শক্তিবৃদ্ধির বিষয়ে তৎপর। এহেন শক্তির বাড়বাড়ন্ত পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে কোন্ পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইছে তা বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

ভারতের মাটিতে হিন্দুরাষ্ট্রের প্রবক্তারা অর্থাৎ এই ধর্মীয় ফ্যাসিস্ট সংগঠনের নেতৃত্ব জার্মানির ফ্যাসিস্ট একনায়কত্বকে সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেনি। এঁরা পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন:

> অনুকূল পরিবেশ থাকলে আরএসএস হবে, যা হয়েছিল জার্মানিতে হিটলার ইয়ুথ বা ইতালিতে ফ্যাসিস্ট যুব সংঘ। শৃঙ্খলা সংগঠিত কেন্দ্রিকতা ও সংঘবদ্ধ চেতনার নাম যদি হয় ফ্যাসিবাদ, তবে আরএসএস নিজেকে ফ্যাসিস্ট বলতে লজ্জিত নয়।[৫০]

অথচ এর বিরুদ্ধে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে কোনও কার্যকর পদক্ষেপের কর্মসূচি নেওয়া হয়নি। বরম বহু বামপন্থী বুদ্ধিজীবীও তাঁদের আত্মসন্তুষ্টি ঔদাসীন্যের কারণেই এই অশুভ শক্তির শক্তিবৃদ্ধিতে রসদ যুগিয়েছিলেন। আজ থেকে সত্তর বছরেরও আগে কবি সমর সেন লিখেছিলেন : "বুদ্ধিভ্রংশ তারি ঘটে, সর্বনাশ ভবিতব্য যার।" সমকালের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী সেইসময় লিখেছিলেন :

> দার্শনিক ভিত্তি থাকুক আর নাই থাকুক, আমাদের দেশের পণ্ডিতদের ঝোঁক তবু ফ্যাসিজমের দিকেই শেষপর্যন্ত যেয়ে দাঁড়ায়। অযৌক্তিক ফ্যাসিজমই আমাদের যুক্তি-অভিমানী বুদ্ধিজীবীদের বেশি আকৃষ্ট করে। ...এটা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির দৈন্য ছাড়া আর কিছুই সূচিত করে না।[৫১]

সাত দশকেরও বেশি সময়ের আগের এই কথাগুলো কি আজও আমাদের দেশের ফ্যাসিস্ট প্রবণতার আগুনে হাওয়া-দেওয়া বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশের ভূমিকা থেকে স্পষ্ট হয় না? বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশের দায়িত্বহীনতায়, বিবেকক-বুদ্ধি বিক্রয়ের ঘটনায় স্বয়ং রমাঁ রলাঁ পর্যন্ত একটা সময় আত্মগ্লানিতে আর্তনাদ করেছেন।

১৯৩৫ সালের ২০ আগস্ট কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল :

> ফ্যাসিজম জয়যুক্ত হইলে সাধারণের ভাগ্যে কি ঘটে ফ্যাসিস্ট জার্মানি সারা দুনিয়াকে তাহা স্পষ্ট দেখাইতেছে। উন্মত্ত ফ্যাসিস্ট সরকার শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানদের, তাঁহাদের নেতা ও সংগঠকদের কারাগারে বন্দিনিবাসে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতেছে। ...আন্তর্জাতিক প্রতিবিপ্লবের ঝটিকা বাহিনী হিসেবে তাহারা অগ্রণী।[৫২]

এর প্রায় দুবছর আগে (১৯৩৩-এর অক্টোবরে) রোথারমিয়ার প্রেসের তরফে সরাসরি কমিউনিস্ট বিরোধিতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ফ্যাসিস্ট হুঙ্কার উচ্চারিত হয়েছিল এইভাবে :

> The sturdy young Nazis of Germany are Europe's guardians against the communist danger.[৫৩]

সাত দশকেরও বেশি আগে উপরি-উক্ত উচ্চারিত বক্তব্যগুলি সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রট সরকার গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এমন তথ্য অপ্রতুল। অথচ ফ্যাসিবাদের পরাজয় পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে তাঁরা ঘটা করে অনুষ্ঠান করেছিলেন। আর এখন তো পশ্চিমবাংলায় সেই সরকারি বামপন্থীরা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে আরও একটা জনস্বার্থবিরোধী তুমুল দক্ষিণপন্থী এবং ফ্যাসিস্তপ্রবণ দল। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা সরকারি বামপন্থীদের অনুশীলিত জনবিরোধী ভূমিকার নিপুণ অনুকৃতিতে বর্তমান সরকার হয়ে উঠেছে জনগণের গণতন্ত্র, স্বাধীনতাও মতপ্রকাশের অধিকারের আন্দোলন দমনের এক কালাপাহাড়ি সরকার। এর বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ-বিক্ষোভকে পুঁজি করে বিজেপি ও সংঘপরিবার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে মসগুল হয়েছে।

পরিশেষে

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সত্তর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পথে। কিন্তু ফ্যাসিবাদ কি সত্যিই পরাজিত? ফ্যাসিবাদ কি সত্যি মৃত? সে যে নতুন শক্তিতে জেগে উঠতে চাইছে আমাদের দেশের মাটিতেই কিন্তু এর বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর কর্মসূচিগত চিন্তাভাবনা এখনও যথেষ্ট দুর্বল বলেই মনে হয়। জোসেফ স্তালিনের একটা বক্তব্যাংশ উদ্ধৃত করছি :

> কেউ কেউ মনে করেন যে একটা সঠিক নীতি নির্ধারণ করে সর্বসমক্ষে সজোরে তা ঘোষণা করা, সাধারণ নিবন্ধ ও সিদ্ধান্ত হিসেবে সে নীতির ব্যাখ্যা করা এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গ্রহণ করাই বুঝি যথেষ্ট। আর তা হলেই একেবারে আপনা থেকেই, যাকে বলে কল টিপলেই যেন,

জয়মাল্য এসে যাবে। এ ধারণা অবশ্যই ভুল।[৫৪]

আমাদের দরজায় এসে কড়া নাড়ছে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ। তাদের ক্রমোত্থানের সম্ভাবনা এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিকে সামনে নিয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন জনবিরোধী সরকারটি পরিস্থিতি বুঝে আশু সুবিধালাভের স্বার্থে যে কোনও সময় এই ফ্যাসিবাদের সঙ্গী হয়ে উঠতেই পারে। স্বভাবতই এই ফ্যাসিবাদ রুখতে চাই নীতিনিষ্ঠ কর্মসূচি, সংগ্রামী যুক্তফ্রন্ট। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সত্তর বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে আমাদের দেশের ক্রমোত্থানরত ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, তার সমস্ত ধরনের প্রবণতার বিরুদ্ধে, নতুন করে শপথ গ্রহণ করার ঐতিহাসিক কর্তব্য আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই কর্তব্যে অবহেলার পরিণাম হবে মানবতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

বাবরি মসজিদ ধ্বংস, দেশজুড়ে সুদীর্ঘ সংস্কৃতির পরিচয় বহনকারী বিভিন্ন মুসলিম স্থাপত্যকলা ও মসজিদের ওপর ধ্বংসের পরোয়ানা জারি করে সংঘপরিবার সংস্কৃতির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। সে যুদ্ধ জারি আছে, থাকবেও। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন শিল্পীর ওপর হামলা চালিয়েছে তারা। কারগিল যুদ্ধের সময় দিলীপকুমারের ওপর পাকিস্তানি খেতার ত্যাগ করার জন্যে চাপ সৃষ্টি করে একদিকে যেমন সংস্কৃতির ওপর গোয়বলসীয় কায়দায় বন্দুকের আধিপত্য কায়েম করার প্রয়াস পেয়েছিল, তেমনি কারগিল যুদ্ধকে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের খাতে বইয়ে দিয়ে হিটলারের ইহুদিবিদ্বেষের প্রেরণায় মুসলিমবিরোধিতাকে সর্বাত্মক রূপ দিতে চেয়েছিল। মুসলিমদের পাশাপাশি খ্রিস্টানদের ওপর পাশবিক হামলার ক্রমাগত নজির সৃষ্টি করেছিল। অস্ট্রেলীয় মিশনারী গ্রাহাম স্টুআর্ডস স্টেইনস ও তাঁর দুই শিশুপুত্রকে পুড়িয়ে মেরে তারা এদেশে নাজি জার্মানির প্রেতাত্মাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের শেষ দুই বছরে সারা দেশে খ্রিস্টানদের ওপর ১৫০টির মতো আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল। আর কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এদের বিজাতীয় ঘৃণা তো এদের ফ্যাসিস্ট মতাদর্শের সঙ্গেই পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করে। আর এখন যেহেতু তারা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতার দখল নিয়েছে, ফলে তাদের এখন আরও আক্রমণশীল হয়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক। সম্প্রতি তামিল লেখক পেরুমলের ওপর পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতেই চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে নতুন করে আর লেখা থেকে নিবৃত্ত করতে চেয়েছে তারা, তাঁকে বদলি করেও মনের ওপর ভয়ঙ্কর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছে। একবার বিরোধী দলের জনৈক নেতা হিটলারকে বলেছিলেন যে তিনি আর যাই হোক হিটলারকে সমর্থন করবেন না। হিটলার তার উত্তরে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ নভেম্বর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন :

> I calmly say, 'your child belongs to us already... What are you? You will pass on. Your descendants, however, now stand in the new camp. In a short time they will know nothing else but this new community. [৫৫]

এই হলো ফ্যাসিবাদের ভয়ঙ্কর রূপ। তারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ফ্যাসিস্ট বানাবার প্রকল্প নিয়ে গোটা মানবসভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল। তারপর বহুবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সোভিয়েত সহ পূর্ব য়ুরোপের পতন হয়েছে। তবু বিপ্লবী মতবাদ এবং সমাজ পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিকল্পহীন থেকে গিয়েছে। মার্কসবাদ বিদেশি ভাবধারায় গঠিত, এদেশে এর কোন প্রাসঙ্গিকতা ও ভবিষ্যৎ নেই— ইত্যাকার কথামালা ও প্রচার-প্রচারণা রাখলেও মার্কসবাদ ও কমিউনিজমের ঘোরতর শত্রু ফ্যাসিবাদের প্রবক্তা এই সংঘ পরিবার ভালোই জানে যে এদেশে তাদের ঈপ্সিত ফ্যাসিবাদ কায়েমের পথে মূল বাধা এই মার্কসবাদী তথা কমিউনিস্টরাই। এব্যাপারে তারা সবচাইতে ভয় পায় নকশালপন্থীদের। লালকৃষ্ণ আদবানি তো ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোনোরকম রাখঢাক না করেই প্রকাশ্যে বলেছিলেন যে নকশালপন্থাই হচ্ছে 'ভারতীয় স্বপ্নের' অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদ প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড়ো অন্তরায়। সংঘবদ্ধ শক্তি দিয়েই এদের উৎখাত করতে হবে।[৫৬]

ফ্যাসিস্ট শক্তি নতুনভাবে, নবোদ্যমে জেগে উঠছে আমাদের এই দেশে, ভারতবর্ষে। নতুন শতাব্দীর চোদ্দটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। দিল্লির নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বসে বিজেপি এখন সংঘপরিবারের স্বপ্নপূরণের খোয়াব দেখছে। পরিস্থিতি ক্রমশই হয়ে উঠছে ভয়াবহ। কর্পোরেট শক্তি এবং বৃহৎ পুঁজির সহযোগিতায় অমিত শক্তির অধিকারী হয়ে এক হিন্দু ভারতের নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে তারা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশীর্বাদ তাদের বাড়তি শক্তি যুগিয়েছে। আমরা এই বিকাশমান ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কোন পথ-পদ্ধতি গ্রহণ করছি তার ওপরেই নির্ভর করছে আগামী দিন-মাস-বছরগুলি কেমন যাবে। নিপীড়িত মানবাত্মার আর্ত কান্নার সময় কলঙ্কিত হবে, না উত্তোলিত লালঝান্ডার নিচে সমবেত মানুষের গর্বিত সমাবেশে লেখা হবে মানবমুক্তির নতুন ইতিহাস!

তথ্যপঞ্জি

১. হীরক বন্দ্যোপাধ্যায় : বেচারা বিলাসরাও : বাইরে ঠাকরে, ঘরে পওয়ার, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, নভেম্বর ২৫, ১৯৯৯

২. শ্যামল চক্রবর্তী : *মৌলবাদের সর্বগ্রাসী আক্রমণ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), কলকাতা, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ, পৃ. ২৩

৩. দেবাশিস চক্রবর্তী : *সংঘপরিবার কেন জনগণের শত্রু*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী), কলকাতা, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ, পৃ. ১৩

৪. *The Asian Age*, November 21, 1999

৫. দেবাশিস চক্রবর্তী। প্রাগুক্ত। পৃ. ২

৬. শ্যামল চক্রবর্তী। প্রাগুক্ত। পৃ ১৫

৭. Robert E. Sherwood : *Roosevelt and Hopkins*. Vol. 2,

Banthaman Books, New York, September 1950, p. 553

৮. Ibid.

৯. সুস্নাত দাশ : *ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাংলা*, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ, পৃ. ২৫২-৫৩

১০. জর্জি দিমিত্রিভ : *শ্রমিক ঐক্য ফ্যাসিবাদ-বিরোধী দুর্গ*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৭৪ সংস্করণ, পৃ. ৬

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১২. দেবাশিস দত্তগুপ্ত : চল্লিশ লক্ষ মানুষের স্মৃতিসৌধ, *নবান্ন*, শারদ ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

১৪. উদ্ধৃত, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী : ফ্যাসিজম ও বুদ্ধিদ্রোহ, *অগ্রণী*, প্রথমবর্ষ, প্রথমসংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৩৯, উদ্ধৃত, *বাংলার ফ্যাসিস্ত বিরোধী ঐতিহ্য*, মনীষা, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ, পৃ. ১৩৬

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

১৬. প্রাগুক্ত

১৭. অনিশ্চয় চক্রবর্তী, আমিত্বের যুক্তিহীন বন্দনা, রবিবাসর, *আজকাল*, জুন ১৮, ১৯৯৫

১৮. দ্র. Statesman, March 3, 1937 উদ্ধৃত, বাংলার ফ্যাসিস্ট বিরোধী ঐতিহ্য। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১৯. বুদ্ধদেব বসু : সভ্যতা ও ফ্যাসিজম, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭, ১০৯

২০. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : সংগ্রাম ও শিল্পী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

২১. উদ্ধৃত, বাংলার ফ্যাসিস্ত বিরোধী ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২২. দ্রঃ উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

২৩. The Sunday Statesman, June 18, 1995 (Impressions, p.3)

২৪. রবিবাসর আজকাল, প্রাগুক্ত

২৫. Quoted in 'On Fascism'. SUCI publication, Calcutta, 1976 edn, p 9

২৬. Ibid, p 12

২৭. দ্র. শান্তনু সিংহ : *ওরা শুধু ভুল করে যায়*, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৮

২৮. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, জুন ১৭, ১৯৯৫, পৃ. ২

২৯. *The Sunday Statesman*, September 10, 1995 (Impression p. 7)

৩০. *The Asian Age*, September 22, 1995

৩১. এ জি নূরানি : *আরএসএস ও বিজেপি শ্রম বিভাজন*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৯

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি সর্দার প্যাটেল বলেছিলেন : "...Rashtriya Swayamsevak Sangh have indulged in acts of violence involving arson, robbery, decoity and murder and have collected illicit arms ammunitions. They have been found circulating leaflets, exhorting people to sort to Terrorist methods..." আর ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের মতে : "the Sangha hopes to be in future India what the Fascists are in Italy and the Nazis in Germany." See *Frontline*, January 22, 2015. p. 9

৩৪. সিতারাম ইয়েচুরি : *এই হিন্দুরাষ্ট্রের শ্লোগান আসলে কী?* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ সংস্করণ

৩৫. দেবাশিস চক্রবর্তী : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩৫ক. *জনচেতনা পুস্তিকা : প্রসঙ্গ গুজরাট একটি পুনর্ভাবনা*, জুন ২০০২ খ্রিস্টাব্দ, পৃ. ৬। অনুরূপ কথা বলেছিলেন স্বয়ং গোয়েবলসও। সংস্কৃতির কথা শুনলে তাঁরও হাত বন্দুকের দিকে চলে যেত। (Quoted by Akhilesh Mithal : The Statues of Culture in the Subcontinent, *The Asian Age*. November 21, 1999) এমনকি জার্মানির রাইখের থিয়েটার চেম্বারের সভাপতি জনৈক হ্যান্স জোনস্ট, যিনি একজন ব্যর্থ নাট্যকার, তিনিও সর্বসমক্ষে গর্বের সঙ্গেই বলতেন : যখনই কেউ সংস্কৃতি নিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করে তখনই তিনি তাঁর রিভলভার খুঁজতে থাকেন! (William L. Shirer : *The Rise and Fall of The Third Reich*, Crest Book, New York, 1962 edn, p. 335) আসলে সংস্কৃতি সম্পর্কে নাৎসিদের এটাই হচ্ছে সাধারণ মনোভাব।

৩৬. প্রাগুক্ত।

৩৭. Caravan, May 1 2014.

৩৮. Ibid

৩৯. *The Times of India*, January 22, 2015

৪০. S. Ghatade : Under the Saffron Flag, *Fountain Ink,* November 2014 P. 016

৪১. Ibid, p. 017

৪২. *Secular Democracy*, January 1974, p. 24-25 Quoted in Ibid, p. 018

৪৩. *Fountain Ink*, Ibid, p. 021-022

৪৪) *The Caravan*, February 2014

৪৫) William L Shirer : *The Rise and Fall of the Third Reich*. Crest Books, New York, 1962, p. 333

৪৬) Ibid, p. 334

৪৭) Ibid, p. 337

৪৮) দ্র. শান্তনু সিংহ : *সহকর্মীদের চোখে লেনিন*, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ, কলকাতা, ১৯৯১

৪৯) নন্দগোপাল ভট্টাচার্য : *বিষাক্ত চক্রান্ত রুখতেই হবে*, মনীষা, কলকাতা, ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃ. ১১-১২

৫০) প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

৫১) সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

৫২) জর্জি দিমিত্রভ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

৫৩) Daily Mail, November 28, 1933

Quoted in R.P. Dutt, *World Politics 1918-1936*, Adhar Prakashan, Patna, 1961. p. 312

৫৪) জর্জি দিমিত্রভ : প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

৫৫) William L Shirer : Ibid, p. 343

৫৬) See Editorial : A Spectre haunting Advani. *Liberation*, Central Organ of CPI(ML), July 1998, p. 3

প্রবন্ধ

বাংলাদেশে মুক্তচিন্তার সংকট ও সেখানকার সিভিল সোসাইটি

অংশুমান ভৌমিক

একেবারে চমকে দিয়েছিলেন রামেন্দু মজুমদার। নামটা আমাদের সবার কাছে অতটা চেনা নাও হতে পারে, তাই রামেন্দু মজুমদারকে নিয়ে দুটি কথা বলে নিয়ে লেখাটা শুরু করা যাক। মেঘে মেঘে সত্তর ছাড়িয়েছেন ঢাকার ধানমন্ডি মহল্লার সেন্ট্রাল রোডের বাসিন্দা। একটি ডাকসাইটে বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্ণধার। আধুনিক বাংলাদেশী থিয়েটারের একেবারে প্রথম সারির নাটকের দল 'থিয়েটার'-এর কর্ণধারও বটে। নাট্য সংগঠক হিসেবে দুনিয়া জোড়া নাম। ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনসটিটিউটের সভাপতি ছিলেন। বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটির সামনের সারির মুখ। সে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান 'একুশে পদক' পেয়েছেন অনেক দিন আগে। শাহবাগ আন্দোলনে সাংস্কৃতিক কর্মীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সবাই জানে রামেন্দু মজুমদার বাংলাদেশের শাসক দল আওয়ামি লিগের কাছের লোক।

এ হেন রামেন্দু মজুমদারকে কলকাতায় ডেকে এনেছিল বহুরূপী। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাডেমিতে 'কুমার রায় স্মারক বক্তৃতা' দেবার জন্য। মার্চের ২ তারিখ সন্ধে বেলায় গ্রুপ থিয়েটারের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা গুটিয়ে এনে হঠাৎ একটা 'অন্য' প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন ভদ্রলোক। বললেন, বাংলাদেশে যাঁরা মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেন তাঁদের এখন মহাবিপদ! এক ধরনের অরাজকতা চলছে। হরতালের নামে ইস্কুল-কলেজের পড়াশুনো লাটে উঠেছে। পেট্রোল বোমায় পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছেন সড়কপথের আম আদমি। পাঁচ দিন আগে, অর্থাৎ ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধে বেলায়, একুশের বইমেলা থেকে বেরোনোর মুখে খুন হয়েছেন লেখক অভিজিৎ রায়। এইভাবে তো একটা দেশ চলতে পারে না। এর একটা শেষ হবেই। কোনও কোনও বুদ্ধিজীবী পরামর্শ দিচ্ছেন, দুই নেত্রীর মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধান করতে। কিন্তু যারা হত্যাকারী, যারা এভাবে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে মারছে, তাদের সঙ্গে কী আলোচনা হবে? আগে তো সেই হত্যাকাণ্ড থামাতে হবে! তারপরে আলোচনা হতে পারে।

বাংলা আকাদেমির সভা-সমিতিতে আনাগোনা করছি বিশ-পঁচিশ বছর হল। একটি নাট্যালোচনার সভায় এভাবে 'অন্য' প্রসঙ্গের অবতারণা করার সৎ সাহস কেউ দেখিয়েচেন বলে মনে পড়ছে না। ইদানিং মৌলবাদের হিন্দু মুখ, মুসলমান মুখ নিয়ে আমাদের কলকাতার সিভিল সোসাইটির এখানে-সেখানে চর্চা হয়, খুব সামলে-সুমলে, রেখে-ঢেকে। কারও গভীর গোপন ধর্মবিশ্বাসে যাতে কোনও আঘাত না লাগে, কারও শুকিয়ে আসা ক্ষতস্থান থেকে যেন আবার রক্তক্ষরণ শুরু না হয়, এসব থাকে বক্তাদের মনে। ফলে ওপরে-ওপরে আলগা আলুনি-মার্কা কিছু একটা তৈরি হয়, যে সমস্যাটি সংকট হয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে তার হদিশ পায় না আমাদের সিভিল সোসাইটির আন্দোলন। ২০১১ সালের পর থেকে দুয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে সিভিল সোসাইটি উটপাখির অবস্থানেই থিতু হয়েছে। দেশকালের যা অবস্থা তাতে এই পিপুফিশু মনোভাব কত ক্ষতিকারক তার অনুভব কারও মনে আসেনি এমন নয়, কিন্তু সিভিল সোসাইটির সংগঠিত মুখ এখন সুদূরপরাহত। ধর্মীয় মৌলবাদের বিপদসংকেত চেনানো দূরে থাক, পৌর নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য জুড়ে সন্ত্রস্ত পরিবেশ নিয়েও কাকস্য পরিবেদনা চলছে।

বাংলাদেশে চলছে না। রামেন্দু মজুমদারের কথায় তার আভাস ছিল। মার্চের মাঝামাঝি হপ্তা দুয়েক ঢাকায় ছিলাম, হাতেনাতে প্রমাণ মিলল আরও। মুক্তচিন্তার যে পরিসর এখন মৌলবাদীদের চাপাটির ঘায়ে রক্তাক্ত হচ্ছে, তাকে রক্ষা করতে রাজধানী ঢাকা প্রেস ক্লাবে বিভিন্ন ফোরামের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন হচ্ছে রোজ। তাতে আনিসুজ্জামানের মতো শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক যেমন আছেন, তেমনই আছেন অজয় রায়ের মতো কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিক। খবরের কাগজে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছাপা হচ্ছে সেসব খবর। ঢাকায় অনেক নিউজ চ্যানেলে, বুলেটিনে দেখানো হচ্ছে দু-আড়াই মিনিটের বাইট। রাতে টক শো। অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা। জনমত গঠনে তাঁদের কথা অগ্রাধিকার পাচ্ছে। ঢাকার দুটি অভিজাত ক্লাবে অনেক সময় কাটিয়েছি। খানদানি ঢাকা ক্লাব, তুলনায় অর্বাচীন গুলশন ক্লাব। চায়ের টেবিলে, ভোজের আসরে আলোচনার বৃত্তে দেশের চলমান সংকট নিয়ে আলোচনা যত্রতত্র। কিছুতেই এড়িয়ে যাবার বান্দা নন কেউ। ঢাকা ক্লাবে ছুটির দিনের সকালে চিজ ব্রেডে কামড় দিয়ে এক প্রবীণ সিভিল সার্ভেন্ট বললেন, 'ব্যাপারটা খুবই নাজুক, বুঝলেন না!' বলে থেমে গেলেন না। খতিয়ে দেখলেন। অতিথির জিজ্ঞাসার মর্যাদা দিলেন। এই মানুষটি, তার আশেপাশে থাকা মানুষজন, সবাই ঢাকার সিভিল সোসাইটির অঙ্গ।

আমাদের দেশের ধনাঢ্য অভিজাত শ্রেণী যে কতখানি দেশকালবিমুখ তা বালিগঞ্জ, চৌরঙ্গি, আলিপুর পাড়ার পোলিং পার্সেন্টিজ দেখেই বোঝা যায়। বাংলাদেশে এখন ঢাকা

মহানগরী সিভিক ইলেকশনের পালা চলেছে। বনানী, গুলশনের মতো ধনাঢ্য এলাকায় নিদেনপক্ষে চার ভাগের তিন ভাগ ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। আমাদের কলকাতার তথাকথিত 'বড়লোক' পাড়ায় ২০ শতাংশ ভোট পড়লে প্রমাদ গুনবেন বিদায়ী পৌরপিতা। অজয় রায় এই কলমবাগিশকে বলেছেন, অভিজিতের মৃত্যুর পর কোনও সিভিল সোসাইটি মুভমেন্ট দানা বাঁধেনি বলে তিনি আশাহত। শুনে ভেবেছি, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল কোরপান শাহ-কে যেভাবে খুন করেছেন ডাক্তারির ছাত্ররা, যেভাবে মাসের পর মাস পার পেয়েছেন অভিযুক্ত ছাত্রদল, তারপর যেভাবে মৌনী অবলম্বন করেছে আমাদের সিভিল সোসাইটি, তার বৃত্তান্ত শুনলে উনি কী বলতেন! একদিকে অভিজাত ঢাকা, অন্যদিকে দেখেছি ঢাকার সাংস্কৃতিক কর্মীরা কীভাবে রাস্তায় নেমে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন। রোজ নানান তরিকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের সামনে যেখানে 'সন্ত্রাসী'দের (বাংলাদেশে কট্টরপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের 'সন্ত্রাসী' বলা হচ্ছে) চাপাটির আঘাতে লুটিয়ে পড়েছিলেন অভিজিৎ রায়, সেখানে এখন প্রদীপের ব্যারিকেড হয়েছে, গণজাগরণ মঞ্চের টাঙানো ফ্লেক্সে আছে 'অভিজিৎ রায়'-রা হারলে হারবে বাংলাদেশ'।

শাহবাগ চত্বরে ন্যাশনাল মিউজিয়ামের সামনে ফি শুক্রবার বিকেলে জমায়েত। একদল তসলিমা নাসরিনের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে সওয়াল করছেন, আরেক দল মুক্তচিন্তার অধিকার নিরঙ্কুশ করতে গলা ফাটাচ্ছেন, এক দল মানববন্ধন রচনা করে বেঁধে বেঁধে থাকার কসম খাচ্ছেন, আরেক দল পথনাটক করছেন। পথনাটকের কথায় মনে পড়ল, ঢাকায় এখন 'আগুনের জবানবন্দি' নামে একটা পথনাটক হচ্ছে। লিখেছেন বর্ষীয়ান মান্নান হীরা, নির্দেশনাও তাঁর, কলাকুশলীরা সে দেশের জনপ্রিয় নাট্যদল আরণ্যকের। 'আগুনের জবানবন্দি'র অন্যতম অভিনেত্রী মোমেনা চৌধুরী আমাকে নিয়ে গেলেন একুশের স্মারকের সামনে। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললেন, এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা অভিনয় করি। এর পেছনেই ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বার্ন ইউনিট।

পেট্রোল বোমায় পুড়ে ওখানে ভর্তি আছেন অনেক মানুষ। আঙুল তুলে ওদের দেখান। আমাদের কলকাতার কোনও নাট্যদল সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই, নানুর, পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, সান্তর নিয়ে পথনাটক করার কথা ভেবেছে? ভাবেনি। কোনও রাষ্ট্রীয় সংকটে ক্ষুদ্র স্বার্থ সরিয়ে রেখে হাতে হাত মিলিয়ে গলা তুলে কিছু বলতে পেরেছে? পারেনি। নাটকের কথাই বারেবারে বলছি কারণ আমাদের এই উপমহাদেশে এই শিল্পমাধ্যমটিই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে ওতপ্রোত। সিভিল সোসাইটির সঙ্গে এই শিল্পের ঘনিষ্ঠতা চিরকালীন। অথচ আমাদের পথনাটক এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অভিযাত্রী। ঢাকায়, চট্টগ্রামে, এমনকী উপদ্রুত রাজশাহিতে সিভিল সোসাইটির মনের কথা প্রকাশ্যে বলতে নাটকের জুড়ি নেই।

১২-২২ মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচা মহল্লায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ন্যাশনাল থিয়েটার, এক্সপিরিমেন্টাল থিয়েটার, স্টুডিও থিয়েটার, এই তিন জায়গা মিলিয়ে চলল ২য় ঢাকা আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব ও নাট্য সংলাপ। এ কী করে সম্ভব? দেশ পুড়ছে, আর আপনারা নাটক করবেন? উৎসবের হোতা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউটের বাংলাদেশ কেন্দ্রের বক্তব্য খুব পরিষ্কার।

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নাটককেই হাতিয়ার করতে চান তারা। তারা যে সন্ত্রাসীদের ডরান না সেই কথাটি জোর গলায় বলতে চান। ফেস্টিভ্যালের স্লোগান তাই 'থিয়েটার এগেইনস্ট ভায়োলেন্স'। হাল আমলের বাংলাদেশী থিয়েটারের ঝাঁকি দর্শন হল এখানে এসে। সিভিল সোসাইটির আঁতের কথা শোনাচ্ছে এই সব প্রযোজনা। প্রাচ্যনাট্যের 'ট্র্যাজেডি পলাশবাড়ি' কী বলতে চায়? কয়েক বছর আগে ঢাকার অদূরে সাভারে রানা প্লাজা নামে একটি কাপড় তৈরির কারখানা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। পুড়ে মরেছিলেন অনেক শ্রমিক। তাদের অন্দরমহলের কথা শোনায় 'ট্র্যাজেডি পলাশবাড়ি'। থিয়েটার আর্ট ইউনিটের 'না-মানষি জমিন' মোটেই পনেরো বছর আগেকার অস্কার-বিজেতা ছায়াছবির রিমেক নয়। ভারত-বাংলাদেশের কাঁটাতারের মধ্যে আটকে পড়া এক পরিবারকে ঘিরে দু'দেশের সীমান্তরক্ষী আর তাদের খিদমতগারদের মিশ্র অনুভূতির সাতকাহন। কুষ্টিয়ার জেলা শিল্পকলা একাডেমি এসেছিল 'চিয়ারি' বলে একটি প্রযোজনা নিয়ে। একেবারে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের খেই ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের মূলবাসীদের জীবনের প্রান্তিক অবস্থান নিয়ে নাটক। প্রান্তিক বাংলাদেশীয় নাগরিকত্বের সংকটকে একেবারে আতসকাচের তলায় ফেলে খোলামেলা বিতর্ক। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কাছে এখনও নতজানু হয় বাংলাদেশের সিভিল সোসাইটি।

ইদানিংকালে জেন্ডার স্টাডিজের আলোচনাবৃত্তে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধে শুধুমাত্র মহিলাদের ভূমিকাকে 'বীরাঙ্গনা' বলে দেগে দেবার পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবের তীব্র সমালোচনা। যাঁরা রাইফেল হাতে যুদ্ধ করেছেন, যাঁরা খান সেনাদের কাছে 'ইজ্জত' খুইয়েছেন, যাঁরা অহোরাত্র সেবা করে সারিয়ে তুলেছেন সেনাদল, তাঁদের সবাইকে কার্যত নস্যাৎ করে শুধুমাত্র ধর্ষিতাদের 'বীরাঙ্গনা' বানানোর মধ্যে জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদ্যার যে একচোখামি আছে তাকে কার্যত তুলোধোনা করে বই বেরোচ্ছে। পাল্লা দিয়ে নাটক হচ্ছে 'লাল-জমিন', 'যমুনা'-র মতো। গণধর্ষিতার গর্ভজাত সন্তানসন্ততির

সামাজিক পরিচয়ের সংকটকেও নাটকীয় প্রতর্কের বিষয় করতে বাধছে না বাংলাদেশের।

রোজ রাতে অভিনয়ের শেষে ন্যাশনাল থিয়েটারের লবিতে 'মিট দ্য ডিরেক্টর' বলে একটি অধিবেশন হত। নির্দেশকদের মুখোমুখি হচ্ছেন দর্শকরা। বারে বারে উঠে আসছে 'বাঙালি', 'বাংলাদেশী' এই ধারণাগুলি নির্মাণের পটকথা। জাতীয়তাবাদের সংকট থেকে বাংলাদেশ যে ক্রমশ একটি ইসলামিক স্টেট হবার দিকে এগোচ্ছে এ নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাকও শোনা যাচ্ছে নির্দেশকদের মুখ থেকে। এমন অভিজ্ঞতা আমাদের দেশে বিরল।

উৎসব সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে এ কথা অবিশ্যি হলফ করে বলা যাবে না। কারণ ১৮ মার্চ সন্ধের খন্ডযুদ্ধ। এক্সপেরিমেন্টাল হলে সবে থিয়েটার আর্ট ইউনিয়নের 'না-মানুষি জমিন'-এর অভিনয় শেষ হয়েছে। এমন সময় বাইরে ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি দাপাদাপির আওয়াজ কানে এল। চীনের ইয়াংফু থেকে চাইনিজ অপেরার যে কুশীলবরা হল থেকে বেরিয়েছিলেন তারা পড়ি-কি-মরি করে হলে ঢুকে পড়লেন। কেউ কেউ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন, কারও মুখে আতঙ্কের কালো ছায়া। ছুটে গিয়ে দেখি ক্রিকেট ব্যাট, উইকেট হাতে মার-মার শব্দে ছুটে চলেছেন কয়েকজন যুবা। তারা নাকি আক্রান্ত, তাই প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চান। বিদেশি অভ্যাগতদের অকুস্থল থেকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেমে পড়লেন সব বয়সের নাট্যকর্মীরা। পড়ে জানা গেল সাত তলায় স্টুডিও থিয়েটারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজের ছেলেমেয়েরা 'উল্টোরথ' বলে একটা নাটক করছিল। তার মঞ্চস্থাপত্যে একটা কফিন ছিল। স্থানীয় কিছু উটকো ছেলেপুলে ওই কফিন নিয়ে ঠাট্টাতামাশা কূটকচালি শুরু করে। ব্যাপারটা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায়। খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই সেগুনবাগিচার আশপাশের এলাকা থেকে শয়ে শয়ে ছেলে লাঠিসোটা নিয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ে।

কমলবনে মত্তহস্তীর তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। হাতে গোনা কয়েকজন আনসার (নিরাপত্তারক্ষী)-এর সাধ্য ছিল না তাদেরকে সংযত করে। স্পষ্ট দেখলাম পার্কিং লটে অবাধে ভাঙচুর চলছে। বর্ষিয়সী ফিরদৌসী মজুমদার দুষ্কৃতীদের বকাঝকা করে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন। রণক্ষেত্রে নেমে এসে ফোনে পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে সরকারি ওপর মহলের কেষ্টুবিষ্টুদের সঙ্গে কথা বলছেন উৎসবের দুই প্রধান কর্তা রামেন্দু মজুমদার, নাসিরুদ্দিন ইউসুফ এবং একাডেমীর প্রধান লিয়াকত আলি লাকী। রমনা থানা থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘণ্টা দেড়েকের মাথায় আমাদেরকে এসকর্ট করে হোটেলে পৌঁছে দেয় পুলিশ ভ্যান।

পরদিনই আয়োজকদের তরফে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে দরখাস্ত পাঠানো হল, এজাহার করা হল। দু'দিনের মাথায় জাতীয় নাট্যশালার প্রধান প্রবেশপথের সামনে 'জাতীয় নাট্যশালা এবং নাট্যকর্মীদের উপর সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে' বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ। আহ্বায়কদের মধ্যে আইটিআই বাংলাদেশ, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, বাংলাদেশ পথ নাটক পরিষদ সবাই আছে। এসএমএসে খবর গেছে। হাজারো নাট্যকর্মী জমায়েত হয়েছেন। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় শ্বেতপাথরের সিঁড়িতে এসে বসেছেন রামেন্দু মজুমদার, আতাউর রহমান, মামুনুর রশীদ, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ, মান্নান হিরা থেকে শুরু করে সব বয়সের নাট্যজন। সেদিনের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে রামেন্দু বললেন পথচলতি মানুষের উসকানিতে কান না দিয়ে সংযত আচরণ করতে। মামুনুর বললেন, সাড়ে চার দশক লড়াই করে যে ন্যাশন্যাল থিয়েটার তারা অর্জন করেছেন তাকে রক্ষা করার জন্য যদি সশস্ত্র বাহিনীও মজুত থাকে, তাও সই। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে সাজা চাইলেন সবাই। জাতীয় নাট্যশালাকে কলুষিত করার ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করার ডাক দিলেন। সন্ধে নামতে নামতে প্রতিবাদী মিছিল পথে নামল। প্রদক্ষিণ করল শিল্পকলা একাডেমি চত্বর। পা মেলালেন আঠারো থেকে আশির নাট্যজন। তাঁরা দেখিয়ে দিতে চাইলেন আশেপাশের এলাকার দুষ্কৃতীদের তাঁরা পরোয়া করেন না।

তাঁরা গেয়ে উঠলেন ''তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি / তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি''। ১৯৭১ সালের এ গান এক ভারতীয়ের লেখা, এক ভারতীয়ের রেকর্ড করা। অথচ এ গান বাংলাদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষের সগর্ব উত্তরাধিকার।

দেখেশুনে ভাবছিলাম, এপার বাংলাতে দুষ্কৃতীদের হাতে নাট্যকর্মীদের আক্রান্ত হবার ঘটনা এখন আকছার ঘটে। বিমল চক্রবর্তী, বেণু চট্টোপাধ্যায়েরা গত কয়েক বছরের মধ্যে মার খেয়েছেন। অথচ আমাদের নাট্যজগৎ এমন বহুধাবিভক্ত যে প্রতিবাদী সমাবেশেরও পালটা প্রতিবাদী সমাবেশ করতে হয়। ওদেশের নাট্যজনেরা প্রবীণদের 'আমাদের থিয়েটারের মুরুব্বি' বলে মাথায় তুলে রাখেন, তাদের নেতৃত্ব মেনে নেন, পদে পদে তাদের পরামর্শ নেন। আমাদের থিয়েটার তো কবেই অভিভাবকত্বহীন, পরিবর্তনে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়লদের সদম্ভ পায়চারি সর্বত্র! আর সিভিল সোসাইটি! ঢাকাই কুট্টিদের জবানে বলতে ইচ্ছে করছে, 'আর কইয়েন না কত্তা, ঘুড়ায় হাসব!'

নাট্যোৎসবে 'বিদেশি' আমন্ত্রিত অতিথি ঢাকায় আমার চলাফেরা ছিল অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। তাই আমার এই বাংলাদেশ দর্শন ছিল নাট্য জগতে সীমাবদ্ধ; সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ প্রায় ছিলই না। লেখাটিতে তার প্রতিফলন পড়ে থাকতে পারে।

ধারাবাহিক রচনা

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা এবং মুর্শিদাবাদের শ্রমিক-কর্মচারি আন্দোলন

অরূপ চন্দ্র

(প্রথম অংশ)

প্রাককথন

মানব সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতির পথে একটি শ্রেণী পরিশ্রম করে সম্পদ উৎপাদন করে আর অন্য একটি শক্তি সেই সম্পদ বলপূর্বক করায়ত্ব করে ভোগ করে। ক্রীতদাস হিসাবেই হোক বা ভূমিদাস হিসাবেই হোক, তারা শক্তিশালী শ্রেণীটির দ্বারা চরম নিষ্পেষিত হয়ে আসছে কয়েক হাজার বছর ধরে। আদিম সাম্যবাদী সমাজ— যখন মানুষ ফলমূল আহরণ করতো, পশু শিকার করতো, তারপর যখন তারা খাদ্য আহরণের যুগ থেকে খাদ্য উৎপাদনের যুগে অর্থাৎ কৃষিকার্যের যুগে উন্নীত হল তখন থেকেই সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়লো। পৃথিবীতে যখন গোষ্ঠী সমাজ ছিল— তখন এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে পদানত করত। বিজয়ী গোষ্ঠী বিজিত গোষ্ঠীকে দাসে পরিণত করতো। তাদের স্ত্রী কন্যা গৃহপালিত পশুদের দখল নিত। যখন মানুষ কৃষিকাজ শিখল তখন সামন্ত নরপতি ও ভূমিদাস শ্রেণীর জন্ম হলো; একই সাথে চলল ক্রীতদাস প্রথাও। আজও আমাদের দেশে সেই সামন্ত শোষণের অবশেষ রয়ে গেছে। আজও আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি আধা সামন্ততান্ত্রিক। একদিকে জমিদার জোতদার শ্রেণী অন্যদিকে সংখ্যাহীন দরিদ্র ভূমিহীন কৃষি মজুরের অবস্থান।

পৃথিবীর বহুদেশেই মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অভ্যুদয় হয়েছে। সামন্তশ্রেণীর জোয়াল থেকে কৃষিমজুরদের বিদ্রোহে পুঁজিপতি শ্রেণী নেতৃত্ব দিয়েছে। তাদের শিল্পে উৎপাদনের জন্য শ্রমিক সংগ্রহে আর ভূমিদাসত্ব থেকে কৃষিমজুররা মুক্ত হয়ে পরিণত হয়েছে সর্বহারা শ্রমিকে। এক শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে তারা নিবদ্ধ হলো আরেক শোষণের জোয়ালে। আর এখান থেকেই শুরু হল আধুনিক শ্রেণী দ্বন্দ্ব। শুরু হলো পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর দ্বন্দ্বের ইতিহাস। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস রচিত 'কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' গ্রন্থের প্রথম লাইন হচ্ছে— "The history of all hitherto existing society is the history of class struggle." আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস।

ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার গর্ভ থেকে পুঁজির বিকাশের পূর্বেই এদেশ ব্রিটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়। ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা ভেঙে দেয় ব্রিটিশরা, জমিদারদের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে দেয়। অর্থাৎ সামন্তব্যবস্থার শিকড়কে স্থায়ী রূপ দেয়। এছাড়াও, ব্রিটিশরা শুধু ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ ব্যবস্থাটাই ভেঙে দেয়নি, ভারতের প্রাচীন ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পগুলি ও কারিগরি শিল্পগুলির সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন করেছিল।

ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ ব্যবস্থাটা কী? ভারতে জমি কোনদিনই ব্যক্তি মালিকানায় ছিল না। পূর্বে তো নয়ই, মুঘল যুগেও নয়। প্রত্যেক গ্রামসমাজের অধীনে জমি থাকত, তার নির্দিষ্ট এলাকা থাকতো, কৃষকরা সকলে যৌথ চাষ করত। উৎপাদিত ফসল, ফল মাছ প্রত্যেক পরিবারে ভাগ হতো। প্রত্যেক গ্রামে থাকত কামার, কুমোর, তাঁতি, নাপিত, চামার, কলু, দর্জি, ধোপা, পুরোহিত, পণ্ডিত (শিক্ষক), বদ্যি, কবি প্রভৃতি। তারা তাদের উৎপাদন সামগ্রী ও অন্যান্য সেবার বিনিময়ে ফসল বা অন্যান্য সামগ্রী পেত। মুদ্রার চাইতে বিনিময় প্রথার প্রাধান্য ছিল। গ্রামের উৎপাদন সামগ্রীর একটা অংশ কর হিসাবে জমিদার, তালুকদার বা সামন্তরাজাকে পাঠাতে হতো। সেই জমিদার, তালুকদার বা সামন্তরাজারা আবার সম্রাট, নবাব বা বাদশাকে কর পাঠাতো। সম্রাট বা বাদশা কর আদায়ের জন্য দেওয়ানি নির্দিষ্ট করে দেওয়ান নিযুক্ত করত— যিনি কর আদায় করে রাজকোষে জমা দিতেন। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এই আদায় ছিল বলপূর্বক। জমিদার, তালুকদার বা সামন্তরাজার অধীনে বেশ কিছু গ্রাম থাকত কিন্তু জমির মালিকানা থাকত না। ব্রিটিশরা এদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানার সুযোগ করে দিয়ে ভারতীয় সামন্তদের নিজের দালালে পরিণত করে। এবং ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতীয় সামন্তদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জাতীয় পুঁজি ও পুঁজিপতিদের বিকাশকে রুদ্ধ করে ঔপনিবেশিক পুঁজির বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। কার্ল মার্কস তাঁর *ক্যাপিটাল গ্রন্থে* ভারতীয় প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ও ভারত

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অনেক আগেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংল্যান্ডে পৃথিবীর প্রথম শিল্পবিপ্লবের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক বিপ্লব সর্বপ্রথম ইংলন্ডেই শুরু হয়। সেই সময়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে তা উৎপাদনের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করেছিল। ১৭৬৪ সালে আবিষ্কৃত হয় হারগ্রীভ্‌সের স্পিনিংজেনি, ১৭৬৫-তে জেম্‌স ওয়াট্‌সের স্টিম ইঞ্জিন, ১৭৬৯-এ আর্করাইটের জলশক্তি চালিত চাকা, ১৭৮৫-তে কার্টরাইটের যন্ত্রচালিত তাঁত। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের কারিগরি দিকটি দৃঢ়ভাবে শক্তিশালী করেছিল। তাই

পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিকাশে ব্রিটেন তখন সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বিকাশে প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ মূলধন, কাঁচামাল এবং খনিজ পদার্থ। ব্রিটিশরা এই মূলধন, কাঁচামাল এবং খনিজ পদার্থ (কয়লা, লোহা) মূলত লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিল ভারতকে পদানত করে। ভারত থেকে লুণ্ঠিত মূলধন কাঁচামাল ছাড়া ইংলন্ডের বিপুল ধনতান্ত্রিক বিকাশ সম্ভব ছিল না। সুকোমল সেন *ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস* গ্রন্থে লিখেছেন, ''ধনতন্ত্র প্রসারের জন্য যে পুঁজির প্রয়োজন তা বৃহত্তম ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ইংলন্ডের শাসকশ্রেণি প্রধানত ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশগুলিকে লুণ্ঠন ও শোষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের ধনসম্পদ জলস্রোতের মতো ইংলন্ডকে প্লাবিত করেছিল।" আমরা জানি কাঁচামাল হিসাবে ২২ হাজার বেল থেকে ৫০ হাজার বেল পর্যন্ত রেশম সুতো মুর্শিদাবাদ থেকে ব্রিটিশরা নিয়ে যেত। নিয়ে যেত বাংলা থেকে হাজার হাজার মন পাট ও নীল। বোম্বাই, গুজরাট অঞ্চল থেকে নিয়ে যেত হাজার হাজার মন তুলো। এবং সারা ভারত থেকেই অসংখ্য কাঁচামাল ও লুণ্ঠিত সোনা, রূপা, হিরে, মুক্তো ইত্যাদি। নিয়ে যেত হাজার হাজার টন কয়লা ও আকরিক লোহা। আর লক্ষ্য ছিল সেই কাঁচামাল থেকে ইংলন্ডের কারখানায় তৈরি পণ্যগুলি ভারতের বিশাল বাজারে বিক্রয় করা। আর তা করতে গেলে দরকার স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ স্থানীয় বাজারকে ভেঙে দেওয়া।

পশ্চিমে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ও শ্রমিক আন্দোলন

ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লবের পরে ফরাসি ধনতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর আটের দশকে। এবং তারপর জার্মানী, রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে। ফরাসী ধনতান্ত্রিক বিপ্লবে পুঁজিবাদী শ্রেণী মতাদর্শগত এবং চিন্তাগত দিক থেকে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বহু দার্শনিক, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক বুর্জোয়া মতাদর্শের জায়গাটিকে সুদৃঢ় করেন। শোষিত নিপীড়িত কৃষি ও মজুরদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটে। গিলোটিনে নিহত হয় অত্যাচারীরা। ইংলন্ডে যেহেতু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই পুঁজির বিকাশ শুরু হয় ও কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে, শ্রমিকশ্রেণীরও জন্ম হয়। তাই পৃথিবীর প্রথম সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় ইংলন্ডেই, ১৭৫২ সাল থেকে। এগুলিই ছিল পৃথিবীর প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা। কিন্তু এইসব শ্রমিক আন্দোলনগুলি পুঁজিপতিদের হিংস্র নিয়মকানুন এবং বর্বরোচিত আক্রমণের মুখে প্রকাশ্যে সংঘবদ্ধ হতে পারত না। ইংলন্ডের শ্রমিকরা ১৮৩৩ সালে প্রথম গড়ে তোলে 'গ্রান্ড ন্যাশনাল কনসলিডেটেড ট্রেড ইউনিয়ন'। এরপর ১৮৩৭ সালে ইংলন্ডে 'লন্ডন ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশন' এর উদ্যোগে চার্টিস্ট আন্দোলন শুরু হয়— যা ছিল শ্রমিকদের সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলন।

১৮৬৪ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কিংমেনস অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত হয়। লন্ডনের সেন্ট মার্টিন হলে ঐ বছরের ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে উক্ত সংগঠন গঠিত হয়। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অন্যান্য অনেক দেশের শ্রমিক প্রতিনিধিরা তাতে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে কার্ল মার্কস স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন থেকে ঘোষণা হয়, ''শ্রমিক শ্রেণীকে নিজের মুক্তি নিজেকেই অর্জন করতে হবে", ''শ্রমিকের সংগ্রামের লক্ষ্য হচ্ছে সমান অধিকার, মানব জাতির মুক্তির দায়িত্ব এবং শ্রেণী শাসনের অবসান"। ''দুনিয়ার মজুর এক হও"— মার্কস-এঙ্গেলসের *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*-র সেই মহান শ্লোগান দিয়েই এই সম্মেলন শেষ হয়।

১৮৩৭ সালে ইংলন্ডে শুরু হওয়া চার্টিস্ট শ্রমিক আন্দোলন দীর্ঘ লড়ায়ের মধ্য দিয়ে ১৮৪৭ সালে সফল হয়— নারী, শিশু ও পুরুষ সহ সকল শ্রমিকদের জন্য ১০ ঘণ্টা শ্রমের নিয়ম চালু হয়। তার আগে শ্রমিকদের দাসদের মতো ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হতো। তখনও আমেরিকাতে নিগ্রোরা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। শ্বেতকায় শ্রমিকদের কিছুটা স্বাধীনতা বা গণতান্ত্রিক অধিকার পুঁজিপতিরা দিয়েছিল। ইংলন্ডে ধনতন্ত্রের প্রথম আবির্ভাব হলেও তা ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছিল— ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে। ঠিক তেমনি সেইসব দেশে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম এবং জন্মাবধি সংগ্রাম শুরু হয়েছিল।

আমেরিকাতে শ্রমিকরা আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালাচ্ছিলেন। তারপর ১৮৮৬ সালের ১ মে শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট ডাকেন। পুঁজিপতিদের পুলিশ সেই ধর্মঘট বানচাল করার জন্য হিংস্র আক্রমণ চালায়। ৩ মে শিকাগোর ম্যাক কর্মিক রিপার কারখানায় ধর্মঘটি শ্রমিকদের এক সভায় পুলিশ বর্বর আক্রমণ চালিয়ে ছ'জন শ্রমিককে হত্যা করে, অনেকে গুরুতর আহত হয়। পুলিশের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ৪ মে শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পুলিশ শ্রমিকদের ওপর আবার আক্রমণ চালায়। সেই রক্তাক্ত সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সাতজন পুলিশের এবং চারজন শ্রমিকের। কয়েকশো শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। জনৈক আহত শ্রমিক সেই হে মার্কেট স্কোয়ারের যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত সহযোদ্ধার রক্তাক্ত জামাটি জয়ের প্রতীক হিসাবে টাঙিয়ে দেয়। জন্ম হয় শ্রমিকশ্রেণীর লাল পতাকার। ''সেই সংগ্রামের মরণজয়ী নেতা— পার্সনস, স্পাইজ, ফিসার ও এঙ্গেল্সের বিচারের প্রহসন শেষে ফাঁসি হয়।" (সূত্র : *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণির ভূমিকা*— সুকোমল

সেন)। কিন্তু শ্রমিকদের এই জীবনদান বৃথা যায়না। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সেই আন্দোলন। আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন।

ভারতে শিল্প গড়ে ওঠা

ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই একদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পুঁজিপতিরা যেমন বিভিন্ন কারখানা ও শিল্প পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে গড়ে তুললো, তেমনি দেশীয় ধনিক শ্রেণী— যারা রেশম, তুলো ও অন্যান্য কাঁচামাল ইংলন্ড সহ ইউরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানি করে প্রচুর ধনরত্নের মালিক হয়েছিল, যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রচুর জমির মালিক হয়ে অসংখ্য কৃষি শ্রমিককে খাটিয়ে প্রচুর ধনসম্পত্তি করেছিল, যারা নীলকর সাহেবদের পাশাপাশি দেশীয় নীলসাহেব হয়ে প্রচুর নীল রপ্তানি করে প্রচুর ধনের মালিক হয়েছিল— তাদের কেউ কেউ ঔপনিবেশিক পুঁজিপতিদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে কলকারখানা গড়ে তুললো, কেউ কেউ স্বাধীন বুর্জোয়া হিসাবে ছোট মাঝারি কারখানা গড়ে তুললো। শুরু হলো ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশ, যা চরিত্রের দিক থেকে ঔপনিবেশিক। ভারতে জন্ম হল পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর। ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লব বা ফরাসী বিপ্লবের মতো কোনো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম বা বিকাশ হয়নি। সামন্ততান্ত্রিক সমাজজীবনের কুসংস্কার, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, ধর্মীয় বিভেদ প্রভৃতি নিয়েই পিছিয়ে পড়া ক্ষতিকর মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার পিছুটান সঙ্গে করে কৃষি থেকে এসে তারা শিল্পে যোগ দিল। এই পিছিয়ে পড়া চিন্তা ও সংস্কারগুলির মারাত্মক প্রভাব ও কুফল তাই আজও ভারতের শ্রমিক শ্রেণীতে অনেকটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনে এর প্রভাব আজও প্রবাহমান। অন্যদিকে দেশীয় পুঁজির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকল ঔপনিবেশিক পুঁজিপতিদের দ্বারা। তাদের স্বাধীন বিকাশের ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকলো ঔপনিবেশিক পুঁজি। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ হতাশা আক্ষেপে তাই বলেছিলেন, 'ইংরেজরা ভারতীয়দের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি সব কিছু কেড়ে নিয়েছে এবং সবকিছু এখন সরকারের অনুগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।' যারা ব্রিটিশ ফার্মগুলিতে মুৎসুদ্দি বা মুখ্য দালালের কাজ করতো এবং বেনিয়া ও কিছু জমিদার-মহাজন বিভিন্ন কারখানা স্থাপন করতে লাগলো। বোম্বাই-এ পার্শিরা (যেমন জামশেদজী টাটার পিতা নুসসারওনয়াজী প্রমুখ) বিভিন্ন কোম্পানি খুলতে লাগলেন। আর জামশেদজী টাটা ১৯০৮ সালে জামশেদপুরে টাটা আয়রন এন্ড স্টিল ওয়ার্কস স্থাপন করলেন। পূর্বভারতে এই পুঁজিপতিদের অগ্রণী প্রতিনিধি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি নীল কারখানা স্থাপন করেন বেশ কয়েকটি, যার দুটি ছিল মুর্শিদাবাদে, কার-ট্যাগোর এন্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন, আখের চাষ চালু করেন, কয়লাখনি ক্রয় করেন, জাহাজও কেনেন। এছাড়া রাজা রামমোহন কয়েকটি নীল কারখানা করেন যার একটি ছিল মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদেও নব্য ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়, কান্ত মুদিরা (কৃষ্ণকান্ত নন্দী) এর প্রতিনিধি ছিলেন; তাঁর উত্তরসূরীরা যেমন রাজা কৃষ্ণনাথ, রানি স্বর্ণময়ী, মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এবং শ্রীশচন্দ্র নন্দী অনেক কারখানা ও খনি চালু করেন। এইখানে মনে রাখা দরকার, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বস্ত্র শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর উদ্ভব হতে থাকে এবং ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে ভারতীয় পুঁজির দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

ভারতে রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রসার যেমন রেলে লোকো ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠা করে এবং টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং সংগঠিত শ্রমিকের জন্ম দেয় ঠিক প্রায় একই সময়ে ভারতে আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংগঠিত শ্রমিকের আবির্ভাব এবং প্রসার ঘটে। একই সাথে আবির্ভাব ঘটে মূলধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর। এই বুর্জোয়া শ্রেণী ইউরোপের মতো সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জন্ম নেয়নি। বরং ঔপনিবেশিক পুঁজির কোলে চড়েই তার আগমন। স্বাধীন সত্তা তাদের বিশেষ ছিল না। ঔপনিবেশিকদের প্রয়োজনে উৎপাদন এবং তাদের দাসত্ব করাই কাম্য ছিল। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী তাদের নিজের প্রয়োজনেই ভারতীয় সমাজে এই ধনতান্ত্রিক বিকাশ ঘটায়। অনিবার্যভাবে ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের রাষ্ট্র পরিচালনার স্বার্থে এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও দেশীয় মুৎসুদ্দি পুঁজিপতিদের কলকারখানা পরিচালনার প্রয়োজনে এবং তাদের সহযোগী হিসাবে জন্ম হল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। যদিও এই শ্রেণীর একটা অংশের মধ্যেই পাওয়া যায় দেশপ্রেমিক উপাদান এবং রাষ্ট্রীয় পীড়ন ও শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক ও জনসাধারণের লড়ায়ের পক্ষে তাদের সমর্থন।

এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর একাংশ যেমন বাংলার একাধিক কৃষক আন্দোলনের স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই, ঠিক তেমনি বাংলার শিক্ষিত শ্রেণীর একাংশ শ্রমিক সংগ্রামের পক্ষে এগিয়ে আসেন। এঁদের মধ্যে শশীপদ ব্যানার্জীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৭৪ সালে তিনি শ্রমিকশ্রেণীর বক্তব্য প্রকাশের জন্য 'ভারত শ্রমজীবী' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সম্ভবত এটিই ভারতের শ্রমিক স্বার্থে পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র। ১৮৮০ সাল নাগাদ তিনি কলকাতার শ্রমিকদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য 'বরানগর ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮১৮ সালে বোম্বেতে নারায়ণ মেঘানী লোখান্ডে 'দীনবন্ধু' নামে শ্রমিকদের জন্য একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এবং তিনিই প্রথম শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৪ সালে 'বোম্বে মিলহ্যান্ডস অ্যাসোসিয়েশন' তৈরি করেন। বাংলার

ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক পি. সি. মজুমদার বোম্বেতে শ্রমিক এলাকাগুলিতে শ্রমিক এলাকাগুলিতে তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ৭টি নৈশ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

কাপড়কল : ১৮১৮ সালে বাংলায় প্রথম কাপড়কল হাওড়ার বাউড়িয়ার 'ফোর্ট গ্লস্টার মিল' তৈরি হয়, এবং বোম্বাইতে প্রথম ১৮৫৩-৫৪-তে নানাভয় দাভার প্রতিষ্ঠা করেন 'কাওয়াসজী' বস্ত্রমিল। **চা বাগান** : ১৮৩৯ সালে 'আসাম টি কোম্পানি' (ব্রিটিশ) তৈরি হয়। ১৮৯০ সালে এর শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৪,০৬,০৮৯ এবং ১৯০০ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৬৪,৮৯৭ জন। **কয়লাখনি** : ১৭৭০ সালে কয়লা খনি আবিষ্কার এবং তা চালু হলেও ১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বেঙ্গল কোল কোম্পানি'— ঝরিয়াতে। তারপর বড় বড় কয়লাখনি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে ঐ অঞ্চলে। ১৮৯৪ সালে কয়লা শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৩০,৭৭৩ জন। ১৯০৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৪,৫৩৮ জন। **চটকল** : পাটশিল্প ছিল ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের একচেটিয়া ব্যবসা। ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পাট আবিষ্কার করে। ইংলন্ডের ডান্ডিতে ১৮৩৫ সালে প্রথম পাট থেকে সুতো তৈরি হয়। ১৯৫৪ সালে প্রথম রিষড়ার 'অকল্যান্ড মিল' গড়ে ওঠে এবং ১৮৮৬ সালে 'ইন্ডিয়ান জুট মিল এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭৯-৮০-তে চটকল শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৭,৪৮৪ এবং ১৯০২-০৩-এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১,১৮,৯০৪। (তথ্য : *মহাবিদ্রোহ ও তারপর*, সুপ্রকাশ রায়, ২০০৮, র‍্যাডিকাল)

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা

ভারতের এই নবজাত শিল্পগুলিতে যে সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হলো, ক্রমশই তাঁদের সংগ্রামী চরিত্র প্রকাশ পেতে থাকলো। নবোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে এবং ব্রিটিশ শাসককুলের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ শুরু হলো বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে। ''১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের শিল্পকেন্দ্রে ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে কয়েকটি বড় বড় ধর্মঘট করিয়া শ্রমিকগণ তাহাদের দাবি আদায় করিয়ে সক্ষম হয়। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নূতন উৎসাহ উদ্দীপনা ও চেতনার সঞ্চার হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ''মিলহ্যান্ডস এ্যাসোসিয়েশন'' নামে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।'' (*মহাবিদ্রোহ ও তারপর*, সুপ্রকাশ রায়)

১৮৭৭ সালে নাগপুর শিল্পকেন্দ্রে ভারতের প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবিদাওয়াকে কেন্দ্র করে প্রথম থেকেই ব্রিটিশ পুঁজিপতি এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। ১৮৮০ সালেই বালগঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে 'ডাক ও তার' কর্মীরা বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট শুরু করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দৃঢ় হস্তে তা দমন করেন। ১৮০ জন কর্মী ছাঁটাই হয়। ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ বোম্বাই ও মাদ্রাজে বেশকিছু শ্রমিক আন্দোলন সফল হয় ও ১৮৮৪ সালেই ভারতে প্রথম শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ১৮৮৬ সালের আমেরিকার শ্রমিকদের ১-মে'র ঐতিহাসিক ধর্মঘটের আগেই ভারতীয় শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতে শ্রমিকদের প্রথম সংগঠনও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

তবু ভারতীয় শ্রমিকদের রাজনৈতিক আন্দোলনে নামতে আরও একটু সময় লাগে। বোম্বাই-এ শ্রমিকদের অবিসংবাদী নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। ১৯০৭ সালে অনুষ্ঠিত সুরাট কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেস মধ্যপন্থী ও চরমপন্থী দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। মধ্যপন্থীরা ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন প্রত্যাহারের পক্ষে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার দাবি জানালেন এবং হিংসাত্মক পথ সম্পূর্ণ বর্জনের পক্ষে থাকলেন, অপরদিকে চরমপন্থীদের প্রধান নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। তিলক ও তাঁর অনুগামীরা শ্রমিকদেরও রাজনৈতিক গণসংগ্রামে সামিল করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে থাকলেন। এমনকি তিলক জনগণকে রাশিয়ার ১৯০৫-০৭ এর বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিতে বললেন। বালগঙ্গাধর তিলকের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা থাকলেও এই সময়ে তাঁর বিপ্লবী ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র পালের নাম অগ্রগণ্য। একসময় বলা হত ভারত চলবে লাল-বাল-পালের নির্দেশে।

''১৯০৮ সালের ২৪ জুন তিলক বোম্বাই-এ গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মালমায় তাঁর ছয় বছরের কারাদণ্ড হল। তিলকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষে তুমুল গণ-বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। ...১৯০৮ সালের জুলাই মাসে বোম্বাই-এর শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক ধর্মঘট ও তৎসহ জনসাধারণের হরতাল''— এটাই ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক ধর্মঘট। (*ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা*, সুকোমল সেন)

১৯০৮ সালের ২০ জুলাই বোম্বাই-এর প্রায় ৬০টি কারখানার ৬৫,০০০ শ্রমিক তিলকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলেন। ২৩ জুলাই সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধর্মঘট এবং সফল হরতাল অনুষ্ঠিত হয় কারণ ইতিমধ্যেই ২২ জুলাই আদালত বাল গঙ্গাধর তিলকের ৬ বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করেছে। ২৩ জুলাই বোম্বাই-এর রাস্তায় প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু করলো। শ্রমিকদের প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রথম দিকে পুলিশ বাহিনী পিছু হটে এবং পালাতে শুরু করে, পরে শক্তি সঞ্চয় করে শ্রমিক জনতার দিকে গুলি

চালাতে শুরু করে। প্রচুর মানুষ নিহত ও আহত হয়। তাঁদের একজনের নাম গণপত গোবিন্দ, যিনি বীরত্বপূর্ণ লড়াই করে শহিদ হন। ২৩ জুলাই শ্রমিকরা যে প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করেছিল ২৮ জুলাই পর্যন্ত ৬ দিন এই লড়াই চলে বোম্বাই-এর রাস্তায়, নিহত হয় কমপেক্ষ ২০০ জন আহত ও গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সংখ্যাহীন। শুরু হল ভারতীয় শ্রমিকদের 'স্ট্রিট ফাইট' এর অভিজ্ঞতা। আর এই রাস্তাই তো শ্রমিকদের 'যুদ্ধ শেখার স্কুল'।

সুকোমল সেন অত্যন্ত সঠিকভাবেই লিখেছেন, "সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণীর রুখে দাঁড়ানোর পদ্ধতিটি ছিল পৃথিবীর দেশে দেশে অনুসৃত শ্রমিকশ্রেণির স্বভাবজাত পদ্ধতি। ...বুর্জোয়া নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের পথ ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসরফার পথ আর বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণি দেখিয়ে দিয়েছিল যে শ্রমিক শ্রেণির পথ হচ্ছে জনগণকে নিয়ে খোলাখুলি প্রতিরোধের পথ।" এই লড়ায়ে হিন্দু ও মুসলমান শ্রমিকরা সমভাবে যোগ দেয় তিলকের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে, এবং এটি প্রমাণ করে— শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকরা সমস্ত ধর্মীয় বিভেদের উর্ধ্বে অবস্থান করে।

১৯২০ সালে কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এআইটিইউসি গড়ে ওঠে। শ্রমিক নেতা এবং জাতীয় আন্দোলনের স্তম্ভ বাল গঙ্গাধর তিলক এই সংগঠন গড়তে প্রভূত পরিশ্রম করলেও সংগঠনের প্রথম অধিবেশনের কয়েক মাস আগেই ১ আগস্ট তিনি মারা যান। ৩১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ১৯২০, প্রতিষ্ঠা অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপত রায়।

মুর্শিদাবাদ জেলায় শিল্প ও শিল্প শ্রমিক : শুরুর কথা

এরপর মুর্শিদাবাদ বিংশশতকে গড়ে ওঠা শিল্প এবং সেই শিল্প শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনের আলোচনায় যেতে পারি এবং তার প্রেক্ষিতে ভারত বাংলার শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

মুর্শিদাবাদ কৃষি-প্রধান জেলা। এ জেলায় প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষই কৃষিজীবী। নবাবি আমল বা তৎপূর্বে এটি ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী জেলা ছিল, যদিও বর্তমানে এটি ভারতের সবচেয়ে দরিদ্র অনুন্নত জেলা, বলা যায় একটি প্রায় শিল্পবিহীন জেলা। দু'চারটি ছোটখাট কারখানা তৈরি হয়েছিল— বর্তমানে সেগুলিও বন্ধ। অবশ্য নতুন করে কিছু শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে। বহরমপুর সংলগ্ন কাশিমবাজারে (বহরমপুর পৌরসভার অন্তর্গত) মণীন্দ্র উইভিং মিল ১৯৩৯ সালে রাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে এটি ৮০টি তাঁতের ছোট মিল ছিল। এমনিতে ৩০০টি তাঁত থাকলে তাকে বড় কাপড় মিল হিসাবে গণ্য করা হয়। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ১৯৪৬ সাল লাগাদ মিলটি বঙ্গলক্ষী কটন মিলের মালিক এস পি চৌধুরীকে বিক্রি করে দেন। পরে এস পি চৌধুরী আরও ১০৩টি তাঁত যোগ করেন মণীন্দ্র মিলে। মোট ১৮৩টি তাঁত হয়। মণীন্দ্র মিলের পাশেই ১৯৫২ সালে তৈরি হয় বেঙ্গল টেক্সটাইল স্পিনিং মিল (বি টি মিল) কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তরের টাকায় এস পি চৌধুরী এটি তৈরি করেন। ১৯৩৩ সালে ইংরেজ আমলেই গড়ে উঠে ইংরেজ আমলেই ১৯৪৭ সালে বন্ধ হয়ে যায় বেলডাঙ্গা সুগার মিল। এই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্যতম প্রধান কারণ এগুলি লাভজনক না হওয়া— এগুলির ক্ষুদ্রতার কারণে।

বর্তমান মুর্শিদাবাদে বড় শিল্প বলতে রয়েছে— বিংশ শতকের ৮০-র দশকে গড়ে ওঠা ফরাক্কায় এনটিপিসি— ২১০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ২০০৭-এ সাগরদিঘিতে গড়ে ওঠা ৬০০ মেগাওয়াটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র— ডব্লুবিপিডিসিএল বা সাগরদিঘি থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট। এছাড়া বিড়লা গ্রুপ গড়ে তুলেছে ১.৫ মিলিয়ন টন বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন এক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, ওই সাগরদিঘিতেই— নাম 'সোনার বাংলা'। যেখানে 'বিড়লা গোল্ড' নামে সিমেন্ট উৎপাদিত হচ্ছে। ২০১০ সালে লালবাগের নিকটে আয়েশবাগে গড়ে উঠেছে একটি জুট মিল। মালিক ডাব্বু আগরওয়ালের 'সারদা জুট মিল'এ প্রতিদিন গড়ে ১০০ কুইন্টাল পাটের কাজ হয়। শ্রমিক সংখ্যা ৪০০। উৎপাদিত হয় পাটের সুতলি দড়ি এবং নির্মাণ শিল্পে ব্যবহৃত বিশালাকারের চটের চাদর।

১৯৪৭-এর পর ৬৭ বছর কেটে গেলেও মুর্শিদাবাদে আর অন্য কোন বড় শিল্প গড়ে উঠলো না, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সরকার এলেও তারা মুর্শিবাদাদের জন্য কিছুই করেনি, অথচ সবেধন নীলমণি যে তিনটি আধুনিক মিল মুর্শিদাবাদে ছিল (মণীন্দ্র মিল, বিটি মিল, বেলডাঙ্গা সুগার মল) সেগুলি চিরতরে বন্ধ হল।

মুর্শিদাবাদ জেলার শিল্প : বর্তমান অবস্থা

এ জেলার প্রধান কুটির শিল্প ঔরঙ্গাবাদ ও ধুলিয়ান অঞ্চলের **বিড়ি শিল্প**— যার আন্তর্জাতিক বাজারে বিরাট চাহিদা রয়েছে। মুর্শিদাবাদের এই বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত রয়েছে ১০ লক্ষ শ্রমিক। ২০০টির বেশি বড় বড় বিড়ি কারখানা রয়েছে। মুর্শিদাবাদের অন্যান্য কুটিরশিল্প হলো: **রেশম-খাদি শিল্প**— যেগুলি দৌলতাবাদের পাশে চক-ইসলামপুর এবং রঘুনাথগঞ্জের নিকট গণকর-মির্জাপুরে কেন্দ্রীভূত, এছাড়াও আছে কান্দি-খড়গ্রাম সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায়। পশ্চিমবঙ্গে ২৮০টি রেশমখাদি সংস্থার ৯৬টিই মুর্শিদাবাদে। 'মুর্শিদাবাদ সিল্ক' এখনও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন। মুর্শিদাবাদের 'বালুচরী' শাড়ি আরেক আন্তর্জাতিক বিস্ময়। জিয়াগঞ্জের নিকট বালুচর গ্রামে এর উৎপত্তি। বালুচরী শাড়ির আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন

তাঁতি ছিলেন দুবরাজ দাস। মুর্শিদাবাদে জন্ম হলেও বালুচরী শাড়ি এখন বাঁকুড়ার তাঁতিদের হাতেই বিখ্যাত হয়ে উঠছে। এছাড়া রয়েছে বহরমপুরের খাগড়া বাজারে **কাঁসার বাসন শিল্প, গজদন্ত শিল্প, শোলা এবং চন্দন কাঠ শিল্প**। এই কাংস্য শিল্পীরা সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে রানি ভবানীর বড়নগরে বাস করতেন। ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার সময় ঢাকা ও নবাবগঞ্জের সুবিখ্যাত কাঁসা শিল্পীরা রানি ভবানীর বড়নগর ও ধননগর অঞ্চলে চলে আসেন অনেকেই এবং কাঁসার কারখানা গড়ে তোলেন। বর্গী হানায় অতিষ্ঠ হয়ে সর্বস্ব খুইয়ে তাঁরা ব্রহ্মপুরের নিকটে নলখাগড়ার বনে আশ্রয় নেন এবং জঙ্গল সাফ করে ধীরে ধীরে বসতি গড়ে তোলেন। ক্রমে নলখাগড়ার জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটির নাম 'নল' শব্দটি উঠে গিয়ে খাগড়া নামে পরিচিত হয়। খাগড়া শিল্পীদের কাঁসার বাসনের সুনাম বঙ্গদেশ ছাড়িয়ে ভারতে আজও বিখ্যাত।

বর্গি লুটেরাদের আক্রমণে বড়নগরের কাঁসার শিল্পীরা শুধুমাত্র খাগড়া অঞ্চলেই আসেননি, তাঁরা কান্দি, জঙ্গিপুর পাঁচগ্রামেও ছড়িয়ে পড়েন। মুর্শিদাবাদের বাইরে বীরভূমের টিকরবেতা, পাথরকুচি, নদিয়ার নবদ্বীপ, মুড়াগাছা, মাটিয়ারি, বর্ধমানের দাঁইহাট প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু খাগড়ার কাঁসার মান ছিল সবচেয়ে উন্নত। একসময় বর্তমান কল্পনা মোড় থেকে সোনাপট্টি পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকাটি কাঁসারিবাজার নামে পরিচিত ছিল। (তথ্য : এমদাদ উল হক, *স্মরণিকা, বহরমপুর পৌরসভা ১৩০ বছর*) একসময় খাগড়া বাজারে কমপক্ষে ৫০০টি কাঁসার কারখানা ছিল। বর্তমানে ৫০টিও খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রায় একই সময়ে ঐ বর্গি আক্রমণের ফলে একদল স্বর্ণশিল্পীও বড়নগর থেকে খাগড়ায় আশ্রয় নেন। দৈহাট্টার ঐ অঞ্চলটির নাম ক্রমে সোনাপট্টি হয়ে যায়। আর গজদন্ত ও শোলাশিল্প খাগড়ার এই দুটি শিল্পও আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে (যদিও সরকারি নিষেধাজ্ঞায় গজদন্ত শিল্প প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে)।

মুর্শিদাবাদের আর একটি অন্যতম কুটির শিল্প— **শঙ্খশিল্প**। শঙ্খশিল্পের কথা আসলেই জিৎপুরের নাম আসে। ডোমকল থানার দক্ষিণ পশ্চিমে ভৈরব নদীর পূর্বপাড়ে জিৎপুর গ্রাম। এই গ্রামের ৮০ শতাংশের অধিক মানুষ সুপ্রাচীনকাল থেকে শঙ্খশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। মূলত শাঁখা ও শঙ্খ-অঙ্গুরী তৈরিই এই শিল্পের কাজ। এই অঞ্চলে প্রায় ছয় হাজার শঙ্খশিল্পী পরিবার রয়েছে। দরিদ্র নিরন্ন এই পরিবারগুলির কাজের নিশ্চয়তা ও উদরপূর্তির জন্য প্রয়োজন ১৮ লাখ ভালো শঙ্খ। কিন্তু সরকারি জোগান মাত্র চার লাখ। চার ভাগের এক ভাগও নয়। ভালো সিংহলী শঙ্খের আমদানি একরকম বন্ধ। (দ্রষ্টব্য : ভানু বাদ্যির নিবন্ধ, *বার্ষিক বীক্ষণ*, ২০০০)

এছাড়া, মুর্শিদাবাদে **কাঁথা** (নকসিকাঁথা) ও **বালাপোষ** শিল্প উল্লেখযোগ্য। অপূর্ব শিল্পসম্মত সূচিশিল্পের অনুপম কাজ অবাক বিস্ময়ে দেখতে হয়। ভগবানগোলা ও লালগোলায় এই কাঁথা— বালাপোষ শিল্প কেন্দ্রীভূত। কুটির শিল্পের এরকম একটি সমৃদ্ধ জেলায় ভারী শিল্প কিছুই নেই। মূলত সরকারি অবহেলাই মূল কারণ।

অতীতে, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে বহরমপুর শহর সংলগ্ন চুনাখানিতে অনেকগুলি কাগজ তৈরির কারখানা ছিল। জঙ্গিপুরের ঔরঙ্গাবাদে সেই সময় হাতে তৈরি কাগজ (Hand made paper) তৈরি করতেন **মুসলমান কাগজী সম্প্রদায়**। ঐ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে বেশ কয়েকটি সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলছিল বিদেশি বণিকরা। এগুলি ছিল কাশিমবাজার ও কর্ণসুবর্ণে। **মহাবীর ম্যাচ ফ্যাক্টরি** নামে একটি দেশলাই কারখানা গড়ে ওঠে কাশিমবাজারে বিশ শতকের প্রথমে। ১৯১০-এ রাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী ট্যানারি স্থাপন করেন বহরমপুরে এবং কলকাতায় **বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস**। শ্রীশচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে **মণীন্দ্র ব্যাংকিং করপোরেশন** খোলা হয় বহরমপুরে। এছাড়া কাশিমবাজারে রানি স্বর্ণময়ীর (রাজা কৃষ্ণনাথ পত্নী) আমলে বর্ধমানে বেশ কয়েকটি **কয়লাখনি**, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণায় **চিনামাটির খনি** এবং পাকুড় ও নলহাটিতে **পাথর খাদান** চালু ছিল। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর পুত্র ড. সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী আমাকে লেখা তাঁর ১৬.৬.২০১৪-র চিঠিতে লিখেছেন : 'মহারাণী স্বর্ণময়ী বরাকরের পাথর কেটে 'কার্বস্টোন' কলিকাতা করপোশনকে দিয়েছেন যা দিয়ে সমস্ত কলকাতায় তখন ফুটপাথগুলি তৈরী হয়েছিল। দিয়েছিলেন বিনামূল্যে। আমাদের কলকাতার বাড়ীর গাড়ীবারান্দা, সিঁড়ি, পুকুরপাড় ওই পাথরে তৈরী।' রাজা কৃষ্ণনাথ উনবিংশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রাক্ মুহূর্তে ১৮৩৯ সাল নাগাদ সৈদাবাদে শ্বেতা খাঁর বাজারের নিকটবর্তী অঞ্চলে **জাহাজ তৈরির কারখানাও** স্থাপন করেন— তাঁর ইচ্ছা ও স্বপ্ন ছিল 'বহরমপুর-লন্ডন জাহাজ সার্ভিস' চালু করা। যখন তার বয়স ১৮ বছর। কিন্তু ১৮৪৪ সালে ২১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুকে তা স্থগিত হয়ে যায়। এরকম একটি শিল্পোদ্যোগী রাজকীয় পরিবার থাকতেও মুর্শিদাবাদে কোন বড় ভারী শিল্প গড়ে ওঠেনি। এই রাজপরিবারটি বহু ধরনের শিল্পে উদ্যোগী হলেও তা ধরে রাখতে পারেননি, কারণ বোধহয় তাঁরা যতটা দানধ্যান ও সামাজিক কাজে মনোযোগী ছিলেন ততটা আখের গোছাতে নয়।

এগুলি ছাড়াও মুর্শিদাবাদে আরও কিছু ক্ষুদ্র শিল্প ও কারখানা আছে। রঘুনাথগঞ্জের ওমরপুরের নিকট পতাকা বিড়ি প্রতিষ্ঠিত **ফুড প্রসেসিং কারখানা** বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে তৈরি। সারা মুর্শিদাবাদ জুড়ে রয়েছে প্রায় শতাধিক **চালকল**, বহরমপুর বেলডাঙ্গা সহ বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চাশটির

অধিক **তেলকল**, প্রায় সমপরিমাণ **পাথর তৈরির কারখানা**— এগুলির অধিকাংশই বহরমপুর লালগোলা জিয়াগঞ্জে অবস্থিত। লালগোলায় 'ঋষভ' সহ কয়েকটি **ডিটারজেন্ট তৈরির কারখানা** আছে। বেলডাঙ্গায় বেশ কিছু **চুলের কারখানা** আছে যেগুলি চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রসেস্‌ড চুল রফতানি করে প্রচুর বিদেশি মুদ্রা আয় করে। ফরাক্কা ও সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ফ্লাই এ্যাশ থেকে তৈরি **ইটের কারখানা** এছাড়াও অসংখ্য মাটির ব্রিকফিল্ড রয়েছে। মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছোট বড় অনেক **তাঁত কারখানা** যেখানে ধুতি, শাড়ি, মশারি, গামছা তৈরি হয়। বেলডাঙ্গার বড় বড় গামছা খুবই বিখ্যাত। এছাড়া মুর্শিদাবাদে রয়েছে অসংখ্য **শ' মিল**। তাদের মধ্যে কান্দির শ' মিল শ্রমিকরা শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগঠিতভাবে বিক্ষোভ জানায় নকশালপন্থী সংগঠন সিসিইউ-র নেতৃত্বে। এছাড়াও মুর্শিদাবাদে রয়েছে বেশ কয়েকটি মাঝারি আকারের **ফ্লাওয়ার মিল**।

কিন্তু মাঝারি ও ভারী শিল্প বলতে যা বোঝায় তা মুর্শিদাবাদে নেই। অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বাম আমলে **রেজিনগর শিল্প তালুক** তৈরির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে এলাকাটি সেই সময়ে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়েছিল। পরিবর্তনের সরকারের আমলে আরেকবার শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বহরমপুরে পদ্মা পুলিশ হাউজিং-এর পেছনদিকে বেশখানকটা জায়গা নিয়ে **বহরমপুর শিল্প তালুক**-এর উদ্বোধন হয় বাম আমলে— সেখানেও দু'একটি হোটেল ও সিনেমা হল ছাড়া কিছুই হয়নি। বন্ধ মাঝারি কারখানাগুলি খোলার আর কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না।

বেলডাঙ্গা চিনি মিল ছয় দশকের ওপর বন্ধ। বর্তমানে একটি জুট করপোরেশন ওটি ভাড়া নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাম আমলে এটি জলের দামে নফরচন্দ্র জুট মিলের মালিককে বিক্রি করে দেয়। শুধু চিনি মিলের যন্ত্রপাতি বিক্রি করেই কোটি কোটি টাকা আয় হয়। এই চিনি মিলে দুটি বিশাল বিলাসবহুল রেস্ট হাউস, একটি তেল কল, একটি লজেন্স তৈরির কারখানা রয়েছে। আর **মণীন্দ্র-বিটি মিল** বাম আমলে কীভাবে ব্যক্তিগত মালিকানার কাছে গোপনে বিক্রি হল এবং তা জলের চাইতেও কম দরে, তা অতি রহস্যজনক এবং তদন্তসাপেক্ষ। এখন সেখানে এম.সি.ই.টি. কলেজের শাখা খোলা হয়েছে। রাজনীতিক ও আমলাকুলের এই অশুভ আঁতাত আর ভোট রাজনীতির বালাই দেশের শ্রমিক-কৃষক শ্রেণিকে চূড়ান্তভাবে নিঃস্ব করেছে। এর প্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদের শ্রমিক-কর্মচারীদের যে আন্দোলনগুলিতে আমি আলোকপাত করবো সেগুলি হল: ১) ডাক ও তার শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন; ২) রেল ধর্মঘট; ৩) কাশিমবাজার বস্ত্র মিল আন্দোলন; ৪) বেলডাঙ্গা চিনি মিল আন্দোলন; ৫) মুর্শিদাবাদ সরকারি কর্মচারী আন্দোলন; ৬) বহরমপুর পৌরকর্মচারী আন্দোলন; ৭) বহরমপুর রিক্সা শ্রমিক আন্দোলন; ৮) বিড়ি শ্রমিক আন্দোলন; ৯) রেশম খাদি আন্দোলন; ১০) ফরাক্কা ব্যাজে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন; ১১) স্বর্ণশিল্পী আন্দোলন; ১২) ভাগীরথী দুগ্ধ কর্মচারী আন্দোলন; ১৩) কাশিমবাজারে কুলি মজুর আন্দোলন; ১৪) পরিযায়ী শ্রমিক; ১৫) শিশুশ্রমিক প্রভৃতি। মুর্শিদাবাদের এই শ্রমিক ও কর্মচারী আন্দোলন আলোচনা করতে গিয়ে আসবে বঙ্গদেশের শ্রমিক আন্দোলন, ভারত ও বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন প্রেক্ষাপট।

বিংশ শতকে মুর্শিদাবাদের শিল্প ও শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের অনুসন্ধানে আমার আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম যতদূর সম্ভব হল আলোকপাত করলাম— তবু এটি একটি রূপরেখা মাত্র। ভবিষ্যতের গবেষকগণ এর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র লিপিবদ্ধকরণে অগ্রণী হবেন এই আশা রাখি।

ডাক ও তার শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলন (১৯০৮-১৯৫৯)

ভারতে ইংরেজরা উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে দুটি সংগঠিত শিল্পের আমদানি করে যা সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারী শ্রেণীর জন্ম দেয়। একটি হচ্ছে ভারতীয় রেলপথ এবং দ্বিতীয়টি ডাক ও টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং। ইংরেজের এই বিপুল কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করে কার্ল মার্কস বলেছিলেন, 'রেলপথ ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রসার পরিণতিতে লোকো ওয়ার্কশপ প্রতিষ্ঠার সূচনা করবে, টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলি সংগঠিত শ্রমিকদের নিয়োজিত করবে। এবং ফলত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হবে।' ডাক ও তার আন্দোলনের নেতা বিজয় কুমার গুপ্ত তাঁর 'ডাক বিভাগীয় কর্মীদের আন্দোলনের রূপরেখা : ১৯৪৩-১৯৬৩' নিবন্ধে মার্কসের এই উক্তি তুলে ধরে লিখেছেন 'বস্তুত এই টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকরাই এবং চতুর্থ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ডাকঘরের পোস্টম্যান, প্যাকার ও রাণাররাই ভারতবর্ষে ধর্মঘটের মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করেন।' দেখা যাচ্ছে ভারতের সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনের শুরুতে মার্কসের কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়। ১৮৮০ সালেই ডাক কর্মীরা বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট আহ্বান করেন কিন্তু ইংরেজ কর্তৃপক্ষ দৃঢ় হস্তে তা দমন করেন। ছাঁটাই করে ১৮০ জন ডাক কর্মীকে। ভাবুন তখনও লাল পতাকার জন্ম হয়নি। ৪ মে ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো'র হে মার্কেটে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে সেই রক্তাক্ত সংগ্রাম, সেই ঐতিহাসিক লালপতাকার জন্ম হয়নি যখন, ভারতে ডাক কর্মীদের ধর্মঘট মার্কসের ভবিষ্যৎবাণী সফল করে তোলে। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের গোড়াপত্তন হয়। রাণার এবং মেল

ক্যারিয়ারদের মাইনে ছিল তখন ২ টাকা আর পোস্টমাস্টারদের মাইনে ছিল ৫ টাকা। আন্দোলনের সূচনা হলেও টেলিগ্রাফ ইউনিয়ন গঠিত হয় আরও অনেক পরে।

'১৮৯৫ সালে গ্রাজুয়েট কেরানি হিসাবে ১৫ টাকা মাইনেতে পিএন্ডটি-তে যোগ দেন তারাপদ মুখোপাধ্যায়। ডাককর্মীদের অসহনীয় দুরবস্থা দেখে ১৯০৪-এ তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে ডাককর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। এরপর ১৯০৮ সালে হেনরি বারটন তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় টেলিগ্রাফ ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করলেন। ১৯২৯ সালে ডাক-তার ও আরএমএস কর্মীদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পাঁচটি সংগঠন গড়ে ওঠে। কর্তৃপক্ষ ১৯২৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারাপদ বাবুকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে। অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থা এবং সংকটময় পারিবারিক জীবনের মধ্যে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইউনিয়নের হাল ধরলেন ডাকঘরের আর এক কেরানি শ্রী ভূপেন ঘোষ— যিনি পরবর্তীকালে 'দাদা ঘোষ' নামে খ্যাত হন।' (দ্রষ্টব্য : ঐ বিজয় কুমার গুপ্ত)।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের শেষ লগ্ন— দেখতে দেখতে চলে এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংকট হল ঘনীভূত— অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দুদিক থেকেই। ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন ভারতে তীব্রতর হয়ে উঠলো। '৪২ এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, '৪৩ এর ডাক ও তার কর্মীদের আন্দোলন, বোম্বাই-এর সূতাকল ধর্মঘট, রসিদ আলির মুক্তি চাই, রামেশ্বর দিবস, ভারতের পূর্ব সীমান্তে নেতাজির অভিযান, পঞ্চাশের মন্বন্তর (অর্থাৎ ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ) এর বিরুদ্ধে আন্দোলন, দিল্লীতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তির দাবিতে ভারতব্যাপী আন্দোলন, '৪৬ এর বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ। ব্রিটিশ হাড়ে হাড়ে বুঝলো এদেশ ছেড়ে যেতেই হবে। একদিকে ইংরেজ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ অন্যদিকে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ নেতাদের নিয়ে দর কষাকষি বৃটেনের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য আর সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দিয়ে ভারত ভাগের চক্রান্তে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তাক্ত কলকাতা এবং নোয়াখালি, ঐ ১৯৪৬ সালেই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একদিকে অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র কৃষকের লড়াই অন্যদিকে বঙ্গদেশে তেভাগার জন্য ষাট লক্ষ কৃষকের লড়াই ইংরেজ সরকারের অবস্থা তখন 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'। তবু হিন্দু মুসলিম নেতাদের মধ্যে স্থায়ী দ্বন্দ্বের বীজ ঢুকিয়ে দেশ ভাগ করে নিজ স্বার্থ হাসিল করে নিতে চাইল ইংরেজরা।

১৮৪৬ সালে দালভীর নেতৃত্বে পোস্টম্যান এন্ড লোয়ার স্টাফ ইউনিয়ন ১৬ দফা দাবির ভিত্তিতে বোম্বাইতে ১১ জুলাই ধর্মঘট শুরু করে এবং তা ২১ জুলাই থেকে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা, আসাম, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, রাজপুতানা, সেন্ট্রাল প্রভিন্স, রেরার, সিন্ধু বালুচিস্তান সর্বত্র। কর্তৃপক্ষ দালভীর সঙ্গে আলোচনায় বারোটি দাবি মেনে নিলে ৩ আগষ্ট ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়।

১৯৪৩-এ ভূপেন ঘোষ বহরমপুরে এসে উকিল বিজয় কুমার গুপ্তর সঙ্গে দেখা করলেন। তার আগে বিজয়বাবু ডাক-তার নেতা কর্মীদের হয়ে আদালতে কেস লড়তেন সহানুভূতির সঙ্গে। ভূপেশ ঘোষ ডাক-তার ইউনিয়নের সম্মেলনে বিজয় কুমার গুপ্তকে মুর্শিদাবাদ ডাক-তার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক করার প্রস্তাব রাখলেন এবং তা গৃহীত হল। ১৯৪৬-এ ডাক-তার কর্মীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘটে মুর্শিদাবাদের ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়।

বিজয় কুমার গুপ্ত লিখেছেন '১৯৪৬ এর ১৭ জুলাই ডাক-তার কর্মীদের ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। ওয়ারলেস মারফৎ প্রতিটি জেলায় খবর চলে যায়। ১৮ তারিখ বহরমপুরের প্রধান ডাকঘরের পেছনে জড়ো হয় প্রতিটি সাব পোস্ট অফিস ও ই.ডি. কর্মীদের নেতৃস্থানীয়রা। ডাকঘরের পেছনের মাঠে ডাক-তার কর্মীদের বিশাল জমায়েত। সেখানে ঢোকার মুখেই টেক্সটাইল কলেজের ছাত্র (পরবর্তীকালে আরএসপি নেতা) সুহাস দাস বললেন, 'সব শুনেছি। এই ধর্মঘট নতুন ইতিহাস রচনা করবে। আপনারা এগিয়ে যান, আমরা সবাই পেছনে আছি।' সভায় আমন্ত্রিত বক্তা ছিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সম্পাদক শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। তিনি আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেসের সমর্থনের কথা ঘোষণা করলেন। সভা চলাকালীন একটি স্লিপ পেলাম জেলার প্রবীণ বিপ্লবী নেতা মিহির মুখার্জীর কাছ থেকে। তিনি লিখেছেন, 'সভা শেষ হলেই কালোশশীর বাড়ি চলে এসো।' কালোশশী, মানে নীরদ সরকার আর.এস.পি.-র নেতৃস্থানীয় সর্বক্ষণের কর্মী। সেই জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন যুবকদের মধ্যে আর.এস.পি.র সুহাস দাস, অমল রায়, নিতাই গুপ্ত। রিক্সা ইউনিয়নের মকবুল হোসেন ও শ্যাম ধর। নীতিগত কারণে অন্যান্য দলের সঙ্গে সিপিআই-এর বিরোধ থাকায় শুধু তাঁরাই ছিলেন না। কিন্তু প্রাদেশিক স্তরে ধর্মঘট সফল করে তুলতে এগিয়ে এসেছিলেন সি.পি.আই.এর সোমনাথ লাহিড়ী, ড. রণেন সেন, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, জ্যোতি বসু প্রমুখরা।'

সারা ভারতব্যাপী তাঁদের এই ট্রেড ইউনিয়ন এই সংগঠন সম্পূর্ণ White Colour Worker দের দ্বারাই পরিচালিত হত। তাই আন্দোলনকে বলা হত White Colour Trade Union movement এবং ইউনিয়নের পরিচিতি ছিল White Colour Trade Union হিসাবে। যদিও এই ইউনিয়নে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা অর্থাৎ পিয়ন, পোস্টম্যান, প্যাকার, রাণার এরাই ছিল আন্দোলনের প্রধান শক্তি। ১৯০৮ সালে যে টেলিগ্রাফ ইউনিয়নের জন্ম হল হেনরি বারটনের উদ্যোগে এবং তারাপদ

মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়— তা ছিল সম্পূর্ণ White Colour Trade Union। হোয়াইট কলার ওয়ার্কার কাদের বলা হয়? অফিসের শ্রমিক-কর্মচারী, মূলত মানসিক শ্রমে নিয়োজিত যাঁদের কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় কালিঝুলি লাগে না। আর যাঁরা কলকারখানা খনিতে কালিঝুলি মেখে উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ব্লু কলার ওয়ার্কার বলা হয়। আর যাঁরা বিভিন্ন পরিষেবা কাজে যুক্ত শ্রমিক-কর্মচারী তাদের বলা হয় পিঙ্ক কলার ওয়ার্কার। এটিই পাশ্চাত্যের প্রচলিত বিভাজন।

এইখানে আমরা ডাক ব্যবস্থার ইতিহাসের দিকে একটু তাকিয়ে নিই। সম্ভবত মোগল আমলে চতুর্দশ শতাব্দী থেকেই ভারতে আধুনিক ডাক ব্যবস্থার সূচনা। তারও আগে শিক্ষিত পায়রা বা ঘোড়ারা এই কাজ করত। মোগল আমলেই ডাক হরকরা ব্যবস্থা চালু হল। এই ডাক হরকরাদের কখনও নগদে কখনও শস্যের বিনিময়ে সামান্য মজুরি দেওয়া হত। তাদের নাম ছিল 'মুফ্‌তি' বা ফালতু। শেরশাহের আমলে ঘোড়ার পিঠে এবং মানুষের মাধ্যমে ডাক চলাচল ব্যবস্থা চালু হয়। এবং ডাক হরকরাদের অবস্থার সামান্য উন্নতি হয়। মোগল সম্রাট আকবর প্রতি দশ মাইল অন্তর প্রধান প্রধান সড়কের ওপর ডাকঘর গড়ে তোলেন। বাংলায় নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে সুসংবদ্ধ ডাক ব্যবস্থা চালু হয়। যদিও পলাশীর যুদ্ধের পর তার ভেঙে পড়ে। ১৭৮৪ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস এই ব্যবস্থা পুনরায় গড়ে তোলেন এবং এই ফালতু বা ডাকহরকরাদের একটা সরকারি স্বীকৃতি দেন। এরা রাণার বলে পরিচিত হতে থাকে। রাণার বলতে যে চিত্র আমাদের কাছে আছে— একহাতে লণ্ঠন, অন্যহাতে বর্শা, পিঠে চিঠি পত্রের বোঝা— 'রাণার'। রাণার-রাণার রাণার ছুটেছে... সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই অসাধারণ কবিতা। নবাবী ডাক ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার পর জমিদাররাও তাদের জমিদারি টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তাদের কাছারি বাড়িতেই ডাকঘর বসানো শুরু করে এবং কৃষক জনসাধারণের কাছ থেকে ডাক-করও আদায় শুরু করে। চৌকিদারদেরও ডাক বিলিতে কাজে লাগানো হত বিনা মজুরিতে। ১৮২৭ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সম্পূর্ণ ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিজেরা গ্রহণ করে। এর অনেক পরে চতুর্থ দশক নাগাদ ঐ ডাকব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয় টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ারিং। তখনও টেলিফোনের যুগ আসেনি। শুরু হল টরেটক্কার যুগ।

১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে এই ডাক-তার কর্মীদের আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লো। কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, গৌহাটি, করাচি, পেশোয়ার সর্বত্র। রেলপথে আরএমএস-র লালগাড়ি চলছে না, টেলিগ্রাফের টরেটক্কা বাজছে না, কোন ডাকঘরের দরজা খোলা নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। মুর্শিদাবাদের চিত্রটা কী? বহরমপুর ছাড়াও কান্দি, লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, ধুলিয়ান, বেলডাঙ্গা, সালার সর্বত্র ডাক ব্যবস্থা স্তব্ধ। ১৯৪৬ সালের ১৯ জুলাই বহরমপুর শহরে দুটি মিছিল বেরোয়— খাগড়া ভৈরবতলায় ডাক কর্মীদের সভাশেষে একটি মিছিল বেরিয়ে শহরের উত্তর পূর্বাংশের সমস্ত রাস্তা ঘুরে খাগড়া চৌরাস্তা হয়ে গ্রান্ট হলে এসে পৌঁছায়; অন্য মিছিলটি গোরাবাজার নিমতলা থেকে বেরিয়ে ভৈরবতলার মিছিলের অনুগামী হয়ে গ্রান্ট হল আসে। এই মিছিলে যোগ দেন সমস্ত ছোট ছোট ট্রেড ইউনিয়ন— দোকান কর্মচারী সমিতি, পাল্লাদার সমিতি, ঘাটমাঝি সমিতি, রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন, হরিজন সমিতি, ছাত্র কংগ্রেস, ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা। শহরের সমস্ত বাম ও দক্ষিণ দলের রাজনৈতিক কর্মীরা। মিছিলে আওয়াজ ওঠে 'ডাকঘর খুলবে না, টরেটক্কা বাজবে না'। পথের দুপাশে কাতারে কাতারে উৎসুক নরনারী। গ্রান্ট হলের সভায় সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেস নেতা শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন ডাক-কর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক বিজয় কুমার গুপ্ত, শশাংক শেখর সান্যাল, আরএসপি-র অমল রায়, নিতাই গুপ্ত, সিপিআই-এর সনৎ রাহা। সব রাজনৈতিক বিভেদ দলাদলি ভুলিয়ে দিয়ে এই ধর্মঘট ইংরেজ সামাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হানে এক চরম আঘাত। ২০ জুলাই থেকে ১৩ দিন সারা ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা স্তব্ধ। ইংরেজ সরকারের সরকারি কাজও স্তব্ধ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় সরকার। ধর্মঘটীদের স্পর্দ্ধিত উল্লাস। মুর্শিদাবাদে ডাক-কর্মীদের আন্দোলনের নেতা বিজয় কুমার গুপ্ত ছাড়াও ছিলেন রূপাংশু সেন, গঙ্গা ভট্টাচার্য, আনন্দ চক্রবর্তী, কালী মুখার্জী প্রমুখ। ধর্মঘটের নয় দিন পর ২৯ জুলাই ধর্মঘটের সমর্থনে কলকাতা মনুমেন্টের নিচে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের উপস্থিতিতে কয়েক লক্ষ মানুষের সমাবেশ হয় যা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে।

১৯৪৬-এর ধর্মঘটের পর ১৯৫৯ সালে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ডাক-তার কর্মীদের রাজ্য সম্মেলনের গৃহীত দাবিপত্রের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্ডিন্যান্সকে উপেক্ষা করে পাঁচদিন ব্যাপী ঐতিহাসিক আরেকটি ধর্মঘট এক সর্বাত্মক রূপ পরিগ্রহ করে। রেলের কয়েকটি ইউনিয়নও এই ধর্মঘটে সামিল হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যের ৯০ ভাগ কর্মী এই আন্দোলনে যোগ দেয়। কিন্তু বিহার, উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব ঐ ধর্মঘটে খুব কমই সাড়া দেয়। আসলে তখন ঐ ট্রেড ইউনিয়নটিকে তথাকথিত স্বাধীন ভারতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল খণ্ড খণ্ড করে দখল করেছে। ভারতীয় শাসক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকশ্রেণীকে বিভক্ত করতে শুরু করেছে ভোট রাজনীতির স্বার্থে। সংসদীয় দলগুলির ভোটসর্বস্ব ক্ষমতা দখলের লালসাই শ্রেণী সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শত্রু

হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ লড়াই দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিভক্ত করেছে শ্রমিক শ্রেণীকে সংসদীয় পার্টিগুলি। তার শ্রেণীঐক্যে চির ধরেছে, যা সৃষ্টি করেছে সংসদীয় দলগুলির দ্বারা দলীয়করণ এবং সংকীর্ণ রাজনীতিকরণের নীতি।

ঐ সময় মুর্শিদাবাদ জেলায় ডাক বিভাগের কর্মী কুমুদ ভট্টাচার্য, চিত্ত দাস, সুধীরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ, সুব্রত বাগচি, সমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ অনেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন।

রেল ধর্মঘট (১৮৬২-১৯৭৪)

ভারতে ব্রিটিশরা নিজেদের ব্যবসা সম্প্রদারণের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যখন রেললাইন পাতা শুরু করে তখন মজুর হিসাবে নিয়োগ করে মূলত আদিবাসীদের। সম্পূর্ণ ক্রীতদাসের মত তাঁদের খাটানো হত। আর নারী শ্রমিকদের ওপর সাহেব ইঞ্জিনিয়ার ও দেশীয় ঠিকাদারদের সম্ভোগের অন্ত ছিল না। বর্বর ও অমানবিক পদ্ধতিতে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও, হো, রাজবংশী সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের ওপর এই অকথ্য অত্যাচার চলতে থাকতো। তাদের ক্রীতদাসের চাইতেও নিকৃষ্টতম নিষ্ঠুরতম জীবনযাপনে বাধ্য করা হত। সাঁওতাল বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে সাওতাল পরগণা অঞ্চলে রেলওয়ে ঠিকাদার, ইঞ্জিনিয়ার, দিকু (বাঙালি মহাজন, সুদখোর) ও পুলিশের দারোগাদের নির্মম অবর্ণনীয় অত্যাচার নেমে এসেছিল এই সাঁওতাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর, যা ফলশ্রুতিতে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে (১৮৫৫-৫৬) সালে। দেড় বছর তারা প্রায় পাঁচটি জেলাকে স্বাধীন করে ফেলেছিল— সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া। সেই বিদ্রোহে পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল কৃষক যোগ দেয় এবং প্রায় পঁচিশ হাজার সাঁওতাল কৃষকের মৃত্যু হয়। সাঁওতাল রেল মজুরদের বিদ্রোহই সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। এই সাঁওতাল রেল মজুরদের বিদ্রোহই হয়তো ভারতে প্রথম রেলওয়ে শ্রমিক আন্দোলন বলা যেতে পারে।

ভারতের প্রথম রেলওয়ে স্থাপনের কাজ শুরু করে দুটি ব্রিটিশ সংস্থা। ১৮৪৫ সালে গ্রেট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানি এবং দ্বিতীয়টি হল গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে কোম্পানি। ১৮৫৩ সালে প্রথম ২১ মাইল রেলপথ স্থাপন হয়। ১৮৫৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮৮ মাইল। রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে উদ্ভব হল আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর। ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল 'বোম্বে থেকে থানে' এই ২১ মাইল প্রথম রেলপথ উদ্বোধন হল ভারতে। ১৪ কামরার ট্রেনটি সময় নিত ৪৫ মিনিট। ১৮৬৪ সালে কলকাতা-এলাহাবাদ-দিল্লী লাইন স্থাপিত হয় এবং ট্রেন চালু হয়।

ভারতে ব্রিটিশ যুগে যতবার ভারতব্যাপী রেল ধর্মঘট হয়েছে মুর্শিদাবাদের রেল শ্রমিকরা তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে মুর্শিদাবাদের ওপর দিয়ে দুটি প্রধান রেলপথ স্থাপিত হওয়ার পর। মুর্শিদাবাদে প্রথম রেলপথ চালু হয় ১৮৬৩ সালের ২১ ডিসেম্বর— 'নলহাটি আজিমগঞ্জ' লাইনে। এই সময় নলহাটি রামপুরহাট মুর্শিদাবাদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'রাণাঘাট থেকে ভগবানগোলা' ট্রেন চলাচল শুরু হয়।

বঙ্গদেশে প্রথম রেলশ্রমিক ধর্মঘটের কথা জানা যায় ১৮৬২ সালে। ঐ সময়ের 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লিখছেন 'সম্প্রতি হাবড়ার রেইলওয়ে স্টেশনে প্রায় ১২০০ মজুর কর্মত্যাগ করিয়াছে। তাহারা বলে লোকোমটর (গাড়ি) ডিপার্টমেন্টের মজুরেরা প্রত্যহ ৮ ঘণ্টা কাজ করে। কিন্তু তাহাদিগকে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হয়। কয়েক দিবসাবধি কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে। রেইলওয়ে কোম্পানি মজুরদিগের প্রার্থনা পরিপূর্ণ করুন নচেৎ লোক পাইবেন না।' এখানেও ভাবুন, আমেরিকার হে মার্কেটে আটঘণ্টা কাজের দাবিতে রক্তাক্ত লড়াই, শ্রমিকদের সঙ্গে মালিক ও রাষ্ট্রযন্ত্রের যে তীব্র লড়াই সংগঠিত হয়, জনৈক নিহত শ্রমিকের রক্তাক্ত জামা সেখানে শ্রমিকরা টাঙিয়ে দেয়— যা ভবিষ্যতে ঐ প্রতীককে গ্রহণ করে লাল পতাকার জন্ম হয় যা শ্রমিকশ্রেণির পতাকা হিসাবে সারা বিশ্বে গৃহীত হয়, বিশেষত কম্যুনিষ্ট পার্টির শ্রমিক সংগঠনের কাছে— এই লড়ায়ের বহু আগেই ভারতে বারবার আটঘণ্টা কাজের দাবিতে শ্রমিকরা লড়াই করেছে।

বঙ্গদেশে এরপর ১৯০৭ সালে বৃহত্তম রেল ধর্মঘট সংগঠিত করেন পূর্ব ভারতের রেল শ্রমিকরা। ১৮ নভেম্বর, ১৯০৭ থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত ১১দিন ব্যাপী রেল ধর্মঘটে তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মূলতঃ গার্ড এবং ড্রাইভাররা এই ধর্মঘটে ব্যাপক অংশগ্রহণ করে। যদিও এই কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ অথবা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। ভারতীয় ধর্মঘটীদের সংখ্যা সে তুলনায় ছিল কম। ধর্মঘট হাওড়া থেকে বর্ধমান, আসানসোল, মোগলসরাই, এলাহাবাদ, টুন্ডলা, কানপুর, আমাবলায় ছড়িয়ে পড়ে। হাওড়া ও আসানসোল স্টেশন সেনাবাহিনীর দুর্গে পরিণত হয়। ঐ সময় বিপিন পাল সহ কিছু রাজনৈতিক বন্দিকে আসানসোল থেকে ট্রেনে আনার চেষ্টা হলে ২০০ শ্রমিক লাইনের ওপর বসে পড়ে। —(ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রমিক শ্রেণির ভূমিকা— সুকোমল সেন)

১৯২৭ সালে খড়্গপুরে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের (বিএনআর) শ্রমিকরা দুবার দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট করেন। বিভিন্ন ভাষাভাষির এই রেল কলোনি ব্রিটিশ রেল অফিসারদের দ্বারা অমানবিক অত্যাচার ও শোষণের শিকার, সর্বোপরি ব্যাপক ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়। প্রায় ৭৫

হাজার রেলকর্মী ছাঁটাই-এর পরিকল্পনা রেল মালিকরা শুরু করে এই বিএনআর থেকেই। ১৯২৭ সালের ১১ ফেব্রুয়ারী থেকে ধর্মঘট শুরু হয়। রেলওয়ে অকজিলিয়ারি ফোর্সকে ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া হয়। বেপরোয়া বেত, লাঠি, বেয়নেট, রাইফেলের বাঁট ব্যবহার হয়। গুলি ও বেয়নেট চার্জ-এ ১৫ জন শ্রমিক গুরুতরভাবে জখম হয়। সরকারি মতে দশজন। এরপরও ধর্মঘট অটুট থাকে এবং সমগ্র বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে রেলশ্রমিকদের নেতা ছিলেন ভি ভি গিরি (যিনি পরবর্তীতে ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন) এবং দেওয়ান চমনলাল।

২৮ মার্চ, ১৯২৮ সালে লিলুয়ার ইষ্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ে শ্রমিকরা ফেয়ারলি প্লেসে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সদর দপ্তরে ১০ হাজার শ্রমিক মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু তারা তাদের কোয়ার্টারে ফিরে এলে বামুনগাছি লোকো শেডে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়ে দুজন শ্রমিককে হত্যা করে কয়েকজন আহত হয়। শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে দাবিসমূহর মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কাজ করতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত ৯ জুলাই ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

তেভাগা আন্দোলনের সময় আজিমগঞ্জের রেল শ্রমিকরা সাগরদিঘি অঞ্চলের কৃষকদের সংগ্রামে যুক্ত হয়। একই চিত্র আমরা দেখি নকশালপন্থী কৃষক আন্দোলনের সময় আজিমগঞ্জের রেল শ্রমিকদের তাতে অংশগ্রহণ করতে। আজিমগঞ্জ রেলওয়ে কলোনিতে শ্রমিকদের মধ্যে নকশালপন্থী কর্মীদের স্থায়ী ও নিরাপদ আশ্রয় ছিল দীর্ঘদিনের।

আজিমগঞ্জের রেলকর্মী (চিফ্ কোল পুল চেকার) কমলারঞ্জন কুণ্ডু, বর্তমান বয়স ৮০, থাকেন বারোদুয়ারি-আজিমগঞ্জ; ২৮-৮-২০১৪-এর সাক্ষৎকারে জানালেন, '১৯৭৪ এ পূর্বে ১৯৬০ সালে রেলওয়ে মেন্স্ ফেডারেশন যে সংগঠন International Transport Federation'এর সঙ্গে যুক্ত ছিল তাদের ডাকে তিন দিনের ধর্মঘট হয় রেলে। আজিমগঞ্জে ১২ জুলাই আন্দোলন শুরু হয়, ৩ দিন ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। দাবি ছিল need based minimum wage। যাঁরা লাইনে বসে অবরোধ করেছিলেন। তাঁদের ৫০ জনের জেল হয় এবং তাঁরা সাসপেন্ড হন। পরে শাস্তি রদ হয়। আমাদের স্থানীয় নেতা ছিলেন রেলওয়ে গার্ড প্রমথনাথ মুখার্জী। সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ ও অশোক মেটা। সেই সময় রেলমন্ত্রী ছিলেন জগজীবন রাম। সেই সময় রাষ্ট্রীয় অত্যাচার যথেষ্ট হয়েছিল।'

ইন্দিরা গান্ধি তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ৮ মে ১৯৭৪ রেলের ১৭ লক্ষ রেল শ্রমিক কর্মচারী রেলধর্মঘটে সামিল হয় বিভিন্ন দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে। প্রাক্তন রেলকর্মী কমলারঞ্জন কুণ্ডু সাক্ষাৎকারে জানালেন, 'মূল দাবি ছিল Productivity Linked Bonus এবং এই আন্দোলনটি মনে হয়েছিল যেন সরকারের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ।' জর্জ ফার্নান্ডেজ তখন রেলওয়ে শ্রমিকদের নেতা, AIRF এর প্রেসিডেন্ট। যদিও পরবর্তী ভিপি সিং মন্ত্রীসভার মন্ত্রী হন জর্জ ফার্নান্ডেজ। আর তৎকালীন (১৯৭৪-এ) রেলমন্ত্রী ছিলেন ললিত নারায়ণ মিশ্র (১৯২৩-১৯৭৫)। তিনি বিহারের দ্বারভাঙ্গার সাংসদ ছিলেন। ৫.২.৭৩-এ ইন্দিরা গান্ধি মন্ত্রীসভার রেলওয়ে মন্ত্রী হন। রেল ধর্মঘটের পর বিহারের সমস্তিপুরে একটি রেল প্রোজেক্ট-এর উদ্বোধনে এসে ২ জানুয়ারী ১৯৭৫ বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন।

ভারতব্যাপী প্রায় ২১ দিনের রেল ধর্মঘটে— বিপর্যস্ত হয় ভারতে সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা। রেল শ্রমিকদের ওপর নেমে আসে নির্মম অত্যাচার। সেইসময় আজিমগঞ্জ রেলওয়ে কলোনিতে গিয়ে দেখেছি সমগ্র কলোনি পুরুষহীন আর আতঙ্কগ্রস্ত মহিলারা আমাদের চলে যেতে বলছেন— 'যে কোন মুহূর্তে পুলিশ রেড হতে পারে' এই বলে। আজিমগঞ্জ রেলওয়ে শ্রমিকদের অন্যতম নেতা নির্মল ভট্টাচার্য। তিনি নকশালপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল বহরমপুরের সৈদাবাদে। তাঁর ছেলে বিপ্লব ১৯৭১-এর বহরমপুর জেল হত্যাকাণ্ডে শহিদ হন। মুর্শিদাবাদের রেল আন্দোলনে দুটি কেন্দ্র ছিল আমিজগঞ্জ ও কৃষ্ণপুর-লালগোলা। মূলতঃ অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত হলেও রেল ধর্মঘট রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ওপর চরম আঘাত, একই সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরেও— যা রাষ্ট্রযন্ত্রকে বিকল্প করে দেয়।

রেল ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের ওপর এইসময় এমন ভয়ংকর দমনপীড়ন নেমে আসে যে MISA এ্যাক্টে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বহু রেলশ্রমিকের সরাসরি বিচার করে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তিন হাজার রেলকর্মীকে কোনরূপ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে সরাসরি বরখাস্ত করা হয়। রেল কলোনিগুলিতে হামলা, পুলিশী সন্ত্রাস, নারী নিগ্রহ, দৈহিক অত্যাচার চালানো হয়।

এই আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরি মারে রেল শ্রমিক সংগঠনগুলির নেতারা এবং তাদের পেছনে থাকা মূলতঃ বামপন্থী সংশোধনবাদীরা। আর এগিয়ে এলেন শাসক ও শোষক শ্রেণীর রক্ষাকর্তা হিসাবে জেলবন্দি জর্জ ফার্নান্দেজ ২৯ মে '৭৪ ঘোষণা করলেন শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে। এই ধর্মঘট আর কিছুদিন চললে ভারতের শাসকশ্রেণীর বাধ্য হতো রেলকর্মচারীদের যাবতীয় দাবি দাওয়া মেনে নিতে এবং ধর্মঘট পরবর্তী যে ব্যাপক শাস্তি রেল কর্মচারীদের ওপর নেমে এসেছিল তাও রোধ করা যেতো।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

স্মরণ

বাবুর আত্মদহন : ওয়াশিকুর রহমান বাবু

কিশলয় ব্যানার্জী

আমার পোশাকী নাম কিশলয়— ডাক নাম আরো অনেক আদুরে একমাত্র ছেলের মতনই বাবু— মানে একেবারে ছোট্টবেলার বাবু থেকে কিশলয় কিম্বা 'বনস্পতিতে' আমার উত্তরণ হয়নি— হতে পারে না—

সেদিন দেখলাম বাবু খুন হয়েছে—বাবু ছিল একজন নির্ভীক দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একরোখা এবং অবশ্যই বেবাক বুদ্ধ 'বাংলাদেশী' ব্লগার—

এই বাবুর নাম ওয়াশিকুর রহমান বাবু— গত ২০শে নভেম্বর ২০১৪ সালে ফেসবুকে বাবু লিখছে— ''না, আর লিখবো না, যুদ্ধাপরাধ, মৌলবাদ, দেশ, রাজনীতি নিয়ে''— না বাবু আর লিখবে না— বাবুর কলম চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে ঘাতকের হাতে— যেমন করে বন্ধ হয়েছে অভিজিৎ রায়, রাজীব হালদার, তারেক মাসুদ, গোবিন্দ পানসারে, নরেন্দ্র দাভোলকারের কলম— আর প্রতিদিনই বন্ধ করা হচ্ছে তিস্তা সেতলবাদ, হোক কলরব, সুজেট জর্ডন কিংবা বর্ধমানে প্রতিবাদমুখর ছাত্র আন্দোলনকারী কিংবা প্রতিবন্ধীদের মুখ। শুধু এখানে নয়, সারা বিশ্বে— পুতিনের রাশিয়ায়, ওবামার আমেরিকায়, ইসরায়েলে কিংবা ইরাক-ইরান সিরিয়ায়।

আমরা এখন খুব ভালো আছি—আমি হাসি তুমি খুশি— তাহলে একটু চাষ নিয়ে বলি— কী বোকা আলুচাষিরা— ক্ষেতভর্তি আলু আর বেটারা দুমদাম পরকীয়া করে গলায় দড়ি দিচ্ছে! ফসল ফলাবি আর বেচবি— বেচে দেনা শোধ করবি, মেয়ের বিয়ে, বৌয়ের অসুখ, ছেলের পড়াশুনা এসবের খরচ মেটাবি— এর মধ্যে সরকার কী করবে? না ব্যাটারা 'আলুবাজি' করেই মল— যেমন মরেছিল সুজেট— খারাপ মেয়েমানুষ—রাতের বেলা ফুর্তি করবে আর শরীরটাকে টানাটানি করলেই দোষ— যাক্ পাপের বোঝা নিয়েই মরেছে— তাহলে কী নিয়ে বলব— খনি বিল— কি রকম তেলেজলে মিশে শাঁসটুকু ভাগ হয়ে গেল অথবা বিমা বিল— আমি লোকসভা রাজ্যসভা চেঁচিয়ে গণ্ডগোল করে কি রকম শেষ মুহূর্তে ওয়াক-আউট করে সটকে পড়লুম— না জমি বিল নিয়ে কোনো কথা হবে না—কারণ এখন সবাই শিল্পবান্ধব— আরে জমি যেন বাপু সরকার নেবে— মাঠে যাও জমি কেনো— কেবল আমাদের দালালিটি দিয়ে দাও বাপু— কী সুন্দর আমরা জমির আইনে ফাঁকফোকর রেখে দিয়েছি— ফিল্ম সিটি বানাও ছাড় পাবে, ছাড় পাবে উপনগরী বানাতে— বাব্বা নিউটাউনে এখন এক একটা ফ্ল্যাট দেড় কোটি থেকে শুরু— চলো সবাই মিলে প্রসাদ পাই।

তাহলে লিখি স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিয়ে— ও মা, অচ্ছে দিনের কাণ্ডারী প্রথমে ঘ্যাঁচ করে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ কমিয়ে দিল, বরাদ্দ কমছে আইসিডিএস বা অন্যান্য পরিষেবায়, ওষুধের দামের ওপর থেকে চলে গেল সরকারি নিয়ন্ত্রণ— এতে লাফাবার কী আছে— আচ্ছে দিনে সবার স্বাস্থ্যের গত এক বছরে যে কী পরিমাণ উন্নতি হয়েছে তা বলার নয়— তাই তো বরাদ্দ কমেছে, তার থেকে বরঞ্চ কিছু যুদ্ধবিমান, সমরাস্ত্র, বন্দুক, কামান কিনি। এই তো সেদিন এক ধর্মগুরু বললেন, প্রত্যেক ভারতীয় (পড়ুন, হিন্দু) নারীর দশটি করে পুত্রসন্তান প্রসব করা উচিত— তাদের মধ্যে একটি চাষ করবে, একটি আইএএস হবে, একটি সেনাবাহিনীতে যাবে, একটি যাবে আধাসামরিক বাহিনীতে, আর একটি পুলিশে আর বাদবাকী দেশের কাজ করবে বা সন্ন্যাসী হবে— হারাধনের দশটি ছেলের হিসেব বরাবর হয়ে গেল—আর মেয়েদের কী হবে— তারা কি 'পয়দা' হবে না— না হওয়ার জন্য অবশ্য হরেক কিসিমের বন্দোবস্ত আছে— পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ সারা ভারত জুড়ে কন্যাসন্তান বিলোপের অঢেল আয়োজন— ইচ্ছেমতো বেছে নিলেই হলো— না ওসব বলা যাবে না— 'বেটি বাঁচাও' হচ্ছে না— স্বাধীনতার উনসত্তর বছর পরেও—

তাহলে চিট্ ফান্ড, মানে প্রতারকদের বিনা পুঁজির ব্যবসা— ছোটবেলায় বাড়িতে দু-এক পিস আসত লাল চেলি বা আলখাল্লা পরে তামার পয়সাকে সোনার পয়সা করে দেওয়া বা মনস্কামনা পূরণ করার লোভ দেখাত। ততদিনে লোক ও ঠগের দল— দুইই সেয়ানা হয়ে গেছে। ফলে বিশেষ লাভ হত না। আরে এতো টাকার গাছ—মানি প্ল্যান্ট— আজ ১০০ টাকা দাও তো কাল ২০০ টাকা পাবে— এতো ভারী মজা— আর সবাই বলছে জলদি লাও জলদি লাও— ঘটি বাটি বিক্রি করে টাকা রাখো— রাজা বলছে, মন্ত্রী বলছে, চিত্রতারকা, ফুটবলার, লেখক, চিত্রশিল্পী সবাই দরাজ হাতে সার্টিফিকেট বিলোচ্ছে— এরা বড্ড ভালো। এরা যে 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' বানায় কী তার স্বাদ! —সমুদ্রমন্থনে যে গরল উঠেছিল আর মহাদেব নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন এ তার থেকে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী— ভয় কি রে পাগলা আমি তো আছি। আমি আছি, গিন্নী আছেন, নন্দীভৃঙ্গীরা আছে— নে বেটা গেল— মোক্ষলাভ দু সেকেন্ডে— কত কিসিমের মজা—জমি চাইলে জমি পাবি, ফুর্তি করার হোটেল পাবি, বোনাস পাবি, টিভি চ্যানেল, খবরের কাগজ, এমনকি মোটর সাইকেল করার কারখানা— সব ঠিক আছে খালি আসল টাকাটা ফেরত চাইবি না— চাইলে তুই তো কোন

ছাড়্, 'ভাইকেও' রেয়াত করব না। ভালো কথা, আমাদের ক'টা মরা টানার গাড়ি আছে— পারলে আগে থেকে বুক করিস— কে বললে কথাটা— আমরা কি টাকা ফেরত দিই না— সঞ্চয়িতায় ফেরত দিয়েছি— সারদায় দেব— কতটা দেব সেটা অবশ্য অন্য কথা— এসব কথা বলা যাবে না— তাহলে গ্যাসের কথা বলি— ওমা, সে আবার কী— মাটি থেকে কুয়ো খুঁড়ে গ্যাস বের করব আমি— আর কতটা গ্যাস তুলব, কী দামে বেচবো, চুক্তি ভাঙবো কি ভাঙবো না— তা ঠিক করবে তুমি— ইল্লি আর কী— জয়পাল চলে গেল এখন ধর্মেন্দ্র— সে তো বুড়ো হয়েছে— ভিটেতে ঘুঘু চরাব বাবা— চুপ একদম চুপ বাবু শব্দ করিস না— একানড়ে এসে গেছে— না মা একান্ননড়ে— একপীঠ নয় একান্ন পীঠ আর একান্নশো অসুর। তাহলে পরিবেশ— সে তো কবেই নির্মল হয়ে গেছে— গঙ্গা মাই কি জয়— মইলি সাহেব মন্ত্রী থাকাকালীন রেকর্ড করেছিলেন শেষ তিন মাসে পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র দেবার— আমরা প্রথম থেকেই বীরেন্দ্র সেহবাগ— পরিবেশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ একটা উপদংশ মাত্র— আর ছাড়পত্র লাগবে কোথায়? যেখানে থাকে নিষাদ, কীরাতরা— ব্যাদে ওদের বাদ দেওয়া হয়েছে—যে কটা ছিল সালওয়া জুদুম-এর কল্যাণে আক্কেল গুড়ুম— তবু ব্যাটারা নাছোড়বান্দা— আরে বাবা তোদের বাড়ির নীচে যদি সোনাদানা অ্যালুমিনিয়াম থাকে তবে তার দায় কি আমার না তোদের পূর্বপুরুষদের— কে মাথার দিব্যি দিয়েছিল তোদের ওখানে থাকতে— আবার সেই এক কথা— বীরসা ভগবান, সিধো কানহু, আজাদ, কিযেনজি (হুঁ!)— সবকটাকে লটকে দিয়েছি— সাহেবরা এত করে শেখালে— চা বাগানে পাঠালে, নীল সাহেবদের আনলে, মহাজনি জমিদারি বন্দোবস্ত করলে তবু ব্যাটারা নাছোড়— Operation Greenhunt— কী সুন্দর নাম, সবুজ শিকার— চোখ জুড়িয়ে যাবে— সবুজ প্রকৃতির মধ্যে রক্তের নদী, ছিন্নভিন্ন লাশ, জ্বালানো আধপোড়া ঘর, ইতস্তত মুরগি, ছাগল আর চারদিকে সন্ত্রস্ত চাউনি— আহা কী দৃশ্য! গাজাকেও হার মানায়— কবে যে হাতে পাব ড্রোনগুলো— ঠিক করেছি প্রত্যেকটি ড্রোন-এর জন্য স্পনসর নেবো— বেদান্ত, স্টারলাইট, এসার, রিয়ো টিন্টো, ডাও, পসকো, রিলায়েন্স, টাটা... না, ভুল হলো, স্পনসর নয়— প্রত্যেকটা ড্রোন-এর জন্য auction হবে— এক্কেবারে spectrum-এর মতো— এরিয়া ভাগ করবো— potential অনুযায়ী তারপর bidding— বিজ্ঞাপনে ট্রেলার থাকবে গাজা, আইসিস, বাবরি, ভূপাল আর অবশ্যই অপারেশন গ্রিনহান্ট-এর— কোম্পানি গুলো যা খাবে না! হৈ চৈ একটু হবে— তার তার জন্য Amnesty, Greenpeace সবারই বন্দোবস্ত করা আছে— মাভৈ! Make in India Boss— এসব কী হচ্ছে বাবু— বাবুমশায় তাহলে শিল্প— ওষুধ শিল্প— তুমি ব্যবসা করবে তার মেধাস্বত্ব পাবে না এসব হয় না কি—আরে বাবা লোকে ওষুধ খাবে না— এমনিতে আমাদের বিজ্ঞান কত উন্নত ছিল— পুষ্পক রথ ছিল, প্লাস্টিক সার্জারি ছিল (গণেশের নইলে এত বুদ্ধি হয়), তার ওপরে বিশল্যকরণী ছিল— ওষুধ কিনিস না— বাঁচিয়ে দেব, মহামৃত্যুঞ্জয়ী কবচ দিয়ে সবাইকে বাঁচাব— তবে শাস্ত্র মেনে— বামুন বাঁচবে, ক্ষত্রিয় বাঁচবে, বৈশ্য বাঁচবে—আর বাকিরা, ওদের তো জল অচল, গরুখেকোর জাত— তারা নাকি আমাদের মেয়েদের বিয়ে করতে চায়— দিয়েছি লটকে খাপ পঞ্চায়েতে— আরে সতীর মাহাত্ম্য জানিস না, বোনটাকে ভাইরা ঝুলিয়েছে— বিধবা বৌদিকে দেওররা— দলিত ছেলেটাকে কেটেছে— আর বিদেশিগুলো? ওমা, ওরা তো সব অনুপ্রবেশকারী বহিরাগত— ওদের গুণতির মধ্যে আনি না। কী বল্লি, শিক্ষা? আমাদের শিক্ষা একটাই। উচিত শিক্ষা দিতে হবে। সব্বাইকে। বিধর্মীদের, মাকুদের (ব্যাটারা বলে সবাই সমান), বিষমকামীদের (ওরে বাবা উচ্চারণ করতে পারি না যে), যুক্তিবাদীদের (বলে কিনা ভগবান নেই!), চাষিদের (আরে শহরগুলো তো তোদের জন্যই হচ্ছে), কীসব বুলেট ট্রেন, রকেট, স্কাইওয়াক, করিডর তৈরি হবে— কারখানার কাজ হারানো মজুরদের (লজ্জা কী ভাই, জীবনই অনিত্য তায় আবার চাকরি), সরকারি কর্মচারী (হারামজাদা অকৃতজ্ঞ) — না ভাই আর লিখব না— ওয়াশিকুর বাবু, আমার সাহস নেই — আমার বৌ বাচ্চা আছে— আমি বাবু— কিশলয় থেকে ঝরাপাতা— তার চেয়ে বরং লিখি আলু, পোস্ত, বিরিয়ানি আর কাবাবের মেনু নিয়ে— আর ছবি পোস্ট করি ফেসবুকে — বিভিন্ন দেশের জিভে জল আনা খাবার— যেসব অকল্পনীয় খাদ্য ও পানীয়ের সমাহার — আমার দেশের আপামর মানুষ চোখে দেখেনি— চেখে তো নয়ই। সেসব খাবারের হদিশ দেন এয়ারপোর্ট থেকে বারাসাতগামী বাসে ওঠা এক ভ্রাম্যমান পুস্তক বিক্রেতা— যার এক ও অনন্য পণ্য হচ্ছে রান্নার বই— ভদ্রলোর মন্ত্র উচ্চারণের মত বলতে থাকেন দেশ বিদেশের নানা পদের কথা— মটন বিরিয়ানি, চিকেন বিরিয়ানি, চিকেন চাপ, মটন রেজেল্লা, দই ইলিশ, ভাপা ইলিশ, রেশমী কাবাব, পিৎজা, পেস্ট্রি, নানান রকমের ডিসার্ট-এর নাম— আর আমি দেখি উদাসীন বাসযাত্রীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত পঙ্গু এক ভিখারি বালক অবাক বিস্ময়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত ঘোরের মধ্যে শুনে চলে এক একটি পদের উচ্চারণ, সেগুলিকে যেন গলাঃধকরণ করতে চায় অদ্ভূত আকুতি দিয়ে— প্রত্যেকটি নাম প্রত্যেকটি বর্ণের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা তার সারাদিনের অভুক্ত রসনাকে যেন চারিয়ে দেয়— আর অনুভব করি সেই মোহাবিষ্ট বালকের মুখগহ্বর থেকে নিঃসৃত লালাস্রোত আমার চোখের

এর পর ৪০ পৃষ্ঠায়

স্মরণ

তাহিরা মাজহার আলী খান

ওমর তারেক আলি

পাকিস্তানের প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগ্রামের পরীক্ষিত নেত্রী তাহিরা মাজহার আলী খান (জানুয়ারি ১৯২৫ - মার্চ ২০১৫) গত ২৩ মার্চ লাহোরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কৃষক-শ্রমিক আর সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে ৭০ বছরের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার অবসানে তাঁর সহযোদ্ধারা সঠিকভাবেই বলছেন: ‘‘আমরা আমাদের সেরা কমরেডকে হারিয়েছি।’’

উল্লেখযোগ্য বর্ণময় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছাপ বহন করে এলেও, প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাহিরার নিজের জীবনব্যাপী সম্পৃক্ততা তাঁকে পাকিস্তানের বাইরেও, বিশেষত ভারতে, অনন্য শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার জায়গায় স্থান দিয়েছিল। পারিবারিক ধারাবাহিকতাকে ছিন্ন করে, সারা জীবন শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ে নিয়োজিত থাকা তাঁকে এক অনন্য অবস্থানে নিয়ে গেছে। তাহিরার মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের নারী ও মৈত্রী আন্দোলনের অনেকের মধ্যে যেভাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে, তাহিরা ছিলেন সত্যিকার অর্থেই পাক-ভারত উপমহাদেশের সম্মুখ সারির একজন শ্রদ্ধেয় প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

দুঃখজনকভাবে, তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশে কোনো প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত না হলেও স্মতর্ব্য যে, তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন পরীক্ষিত বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী। এজন্যই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের ছাপ উপমহাদেশব্যাপী বললে অত্যুক্তি হবে না। পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের উগ্র জাত্যাভিমান আর জাতিগত নিপীড়নকে সাহসভরে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তিনি। ১৯৭১ সালে খোদ পাকিস্তানে অবস্থান করে অসীম সাহসিকতায় তাহিরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর চালানো গণহত্যা আর যুদ্ধের প্রতিবাদে পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার ছিলেন তাহিরা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যার বিরুদ্ধে লাহোরে প্রথম বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁরই ডাকে। সে বিক্ষোভে পথচারীরা ‘বিশ্বাসঘাতক’ হিসেবে তাঁর মুখে থুথু ছিটিয়ে দিলেও টলাতে পারেনি তাঁকে। নিজ দেশের বিরুদ্ধে অবস্থানের কারণে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে ‘১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বৈদেশিক বন্ধু’ সম্মাননা প্রদান করেছিল— নানাভাবে অনুরূপ ভূমিকা পালনকারী ১২ জন পাকিস্তানি নাগরিকদের সঙ্গে।

বাংলার পাশে এর আগেও দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া ছিল তাঁর জীবনের ‘মহাঘটনা’। সে সময় সক্রিয় ছিলেন মহিলা ‘আত্মরক্ষা’ সমিতিতে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কবিতা পাঞ্জাবির কাছে স্মৃতিচারণ করেছেন বাংলার মন্বন্তরে সহায়তার জন্য লাহোরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির উদ্যোগে ত্রাণ তহবিলে নিজেদের হাতের স্বর্ণালংকার খুলে দেবার কথা।

শুধু মুখের কথা দিয়ে সমর্থন যোগাবার মানুষ ছিলেন না তাহিরা দম্পতি। তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ত্রাণ তহবিলে অলংকার দেওয়া ছাড়াও পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত গয়না তুলে দিয়েছেন পার্টির হাতে। সংগঠনের জন্য এমন বিলিয়ে দেবার আরও উদাহরণ আছে তাঁর জীবনে। মাজহার আলী খান লাহোরের মধ্যস্থলে নিজের বাড়ি থেকে নিজ সম্পাদিত ‘ভিউ পয়েন্ট’ পত্রিকা প্রকাশ করতেন, ইউনিয়নের অফিসের জন্য জায়গার প্রয়োজন দেখা দিলে সেই বাড়িটিও তুলে দেন ইটভাটা শ্রমিক ইউনিয়নের হাতে।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিশেষ অনুগত অবিভক্ত পাঞ্জাব প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকান্দার হায়াত খানের কন্যা ছিলেন তাহিরা। বাবার পছন্দের পাত্রকে বাদ দিয়ে, ১৭ বছর বয়সে তিনি বাবার সম্মতি নিয়েই বেছে নিয়েছিলেন নিজের আজীবনের সঙ্গী কমিউনিস্ট সমর্থক মাজহার আলী খানকে। সাত বছরের বড় মাজহার ছিলেন ‘বেকার’। তিনি তখন কৃষক ও শ্রমিক সংগঠক হিসেবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের প্রথম পুত্র, প্রখ্যাত ছাত্রনেতা, লেখক, সাংবাদিক আর আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী তারিক আলী খান যখন জন্ম নেন, তখন মাজহার মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন দু’বছরের জন্য। সেনাবাহিনী থেকে ফেরার পর দক্ষ লেখক আর বাগ্মী মাজহারের সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয়। স্যার সিকান্দারের ব্রিটিশ তোষণের সমালোচনা বাদ যায় নি জনসভায় মাজহারের ঝাঁঝালো বক্তৃতা থেকে।

সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রামে সম্পৃক্ত হবার মাধ্যমে তাহিরা-মাজহারের দাম্পত্য জীবন ক্রমশ মোড় নিতে থাকে তাদের সামন্ত-‘বনেদি’ পারিবারিক ‘ঐতিহ্য’কে ছিন্ন ক’রে। পাকিস্তানে একের পর এক সামরিক শাসন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মতো ঘটনার পরও, নতুন পথে দু’জনেরই সংগ্রামী যাত্রা কখনও আর উল্টো মুখে হাঁটেনি। সারা জীবনই তাহিরা খান নিজেকে জড়িত রেখেছেন নতুন-নতুন সংগ্রামের পুরোভাগে, তরুণ প্রজন্মের চিন্তা ও লড়াইয়ের পাশে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শে, মেহনতি নারী-পুরুষের মুক্তির সংগ্রামে।

ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, আহমেদ নাদীম কাশমি, সাজ্জাদ জহির প্রমুখকে নিয়ে প্রগতিশীল লেখক সংঘ গড়ে উঠেছিল তাহিরা-মাজহারের বাড়িতে। পাকিস্তানে নারী অধিকার আন্দোলনের সূচনায়ও তাহিরার অবদান ছিল উল্লেখ করার

মতো। সাংগঠনিক জীবনের শুরুতে লাহোরে সাইকেলে ঘুরে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন, বিলি করেছেন কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা আর এই ভাবে তাদের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের জায়গা করে নিয়েছেন। ১৯৪৮ সালে যে স্বল্প ক'জন নারীর উদ্যোগে প্রথম প্রকাশ্যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন তার সামনে। ১৯৫০ সালে তাঁর উদ্যোগ ও নেতৃত্বে পাকিস্তান গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি (ডিডব্লুইএ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং পাকিস্তানে তিনি প্রথম শ্রমিক ও নারী অধিকার আন্দোলনের সম্মিলন ঘটান। তাহিরার নেতৃত্বে এই মহিলা সমিতিই পাকিস্তানে প্রথম দাবি তুলেছিল নারীদের জন্য সমানাধিকারের। মানবাধিকারের যেকোনো প্রশ্নে সবসময়ই তাঁর অবস্থান ছিল দৃঢ় ও অনড়, যার জন্য তিনি পাকিস্তানের শাসকদের ভয়ের কারণ হয়ে থেকেছেন সব সময়ই। ১৯৬০ সালে জেনারেল আইয়ুব খান মহিলা সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। ভুট্টো জমানায় কিছুটা উদার আবহাওয়ার সুযোগে ভারতীয় সহযোদ্ধাদের নিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনে উদ্যোগ নিলে তাকে বাধা দেওয়া হয় সরকারিভাবে।

তাহিরা সংগঠনহীন কোনো স্বাধীন বামপন্থী ছিলেন না। বরাবরই পাকিস্তানে বামপন্থী সংগঠন গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত ছিলেন তিনি। তিনটি বামপন্থী দল মিলে আওয়ামী ওয়ার্কার্স পার্টি গঠিত হবার আগে, তিনি ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স পার্টির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

জেনারেল আইয়ুব খান থেকে জেনারেল জিয়াউল হকের সময় পর্যন্ত পাকিস্তানে এমন কোনো স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলন নেই যেখানে তাহিরা ও তাঁর স্বামী মাজহার আলী খানের সক্রিয় উপস্থিতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষত শেষোক্ত জেনারেলের জমানায় তাহিরা সামরিক শাসন, ইসলামিকরণ আর নানা ধরনের বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করেছেন নিরলসভাবে।

জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রথম থেকে তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও, আদর্শগতভাবে ভুট্টোর প্রতিক্রিয়াশীল কাজের সমালোচনা থেকে তাহিরা কখনও বিরত থাকেননি। ক্ষমতায় আসার পর ভুট্টো তাহিরার পুত্র তারিক আলীর পাকিস্তানে আসার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন রাজনৈতিক ভীতির কারণে। ভুট্টোকে মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তাহিরার তীব্র সমালোচনার পরই সে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন ভুট্টো।

ভুট্টোকে সরিয়ে সেনাশাসক জিয়াউল হক ক্ষমতায় আসার পর মহিলা সমিতি আবারও কাজ করার সুযোগ হারায়। সেনাশাসনের বিরোধিতা করায় তাঁকে আবার কারাগারে যেতে হয়। জিয়াউল হকের শাসন কালে ১৯৮১ সালে তিনি গড়ে তোলেন উইমেন'স অ্যাকসন ফোরাম। হুদুদ আইন জারি করার মতো কুখ্যাত ইসলামিকরণের উদ্যোগগুলির প্রতিবাদে সংগঠিত করেন নারী ও গণতন্ত্রী মানুষদের। বৈষম্যমূলক নানা আইনি উদ্যোগ প্রচলন করার প্রয়াস আর নারী ও নাগরিক অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে তাহিরা সক্রিয়তা বজায় রাখেন সামরিক দমন পীড়নের মুখে। অনেক ক্ষেত্রেই জিয়াউল হক সহ পরবর্তী ক্ষমতাসীনরা এমন কিছু নাগরিক অধিকার খর্বকারী বিষয়কে বাস্তবায়িত করতে সফল হয়ে উঠতে পারেনি এ ধরনের প্রতিবাদের মুখে।

বার্ধক্য এতটুকু টলাতে পারেনি তাহিরা আলীকে। বয়স হয়ে যাওয়ার পরও নিয়মিত বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নিয়ে অনুপ্রেরণায় উৎস হয়ে থেকেছেন অসুস্থ হবার আগে পর্যন্ত।

তাহিরা ও তাঁর স্বামীর বন্ধু-কন্যা নীলম হুসেইনের অনুভব হয়ত অন্তত দু' প্রজন্মের উপর তাহিরার জীবনের প্রভাবকে সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ করেছে :

> আমার মনে হয়েছে আমার ও অন্যান্য যেসব নারীর জীবনকে তিনি ছুঁয়ে গেছেন, তাদের জন্য তাঁর সবচেয়ে বড় উপহার হচ্ছে আমাদের মাঝে এই উপলব্ধি সজাগ করা যে, মেয়েদের ভুবন ঘরকন্নার কাজ আর মাতৃত্বের ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে অনেক ব্যাপক। একটি স্বপ্নভূমির মতো যে দুনিয়া আমাদের সামনে আছে, সেটিকে নিজের বলে দাবি করাই আমাদের কাজ। উত্তর-প্রজন্মের জন্য নিজস্ব স্বপ্নভূমির প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের এমন সচেতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে রেখে যাওয়াই তাহিরা মাজহার আলী খানের বড় কৃতিত্ব।

তাহিরা আলী খানের সংগ্রামী ও জন সংহতির চেতনার ধারাবাহিকতা পাকিস্তানের সীমানা পেরিয়ে ভারত আর বাংলাদেশেও জাগরূক থাকুক এটিই আমাদের প্রত্যাশা।

বাবুর আত্মদহন : ওয়াশিকুর রহমান বাবু

৩৮ পৃষ্ঠার পর

জলকে লোনা পানিতে পরিণত করে— আমি নিমেষে দেখতে পাই ঘাতকের উদ্ধত ছুরি তোমার হৃদপিণ্ডে তীক্ষ্ম আঘাত হানছে, তোমার রক্তের চট্‌চটে লবণাক্ত স্বাদ আমার জিভে, আমার শিরায় উপশিরায়— আমি শিউরে উঠি, ভয়ে আমার স্বেদকম্প হয়, আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়— আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, যেখানে তুমি হাঁটছিলে সেখানে তোমার শরীরের চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে কাল্‌চে হয়ে গেছে— তোমার চোখের তারা ক্রমশ নয়নতারার রঙ নিচ্ছে, তোমার শেষ প্রশ্বাস এখনও বসন্তের বাতাবী ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছে, তোমার স্বপ্ন ছড়িয়ে যাচ্ছে শরতের সোনা রোদ্দুরে, নতুন ধানের আঘ্রাণে অথবা বৃষ্টি ভেজা দম্পতির নৈকট্যের খুনসুটিতে.... আমি তো রিক্ত এক ঝরা পাতা, এক নিতান্ত ছাপোষা মধ্যবিত্ত জনক— যে কাউকে ধারণ করতে পারে না— কেবল হাতড়ে চলে এক শূন্যতা থেকে আরও এক অর্থহীন, বোধহীন ব্যর্থতার দিকে— ওয়াশিকর রহমান 'বাবু' আমায় ক্ষমা কর— তোমাকে কুর্নিশ জানাবার যোগ্যতা আমার নেই।